ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

পঞ্চম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

পঞ্চম খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ সংকলন)

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
সেলিনা হোসেন, সেক্রেটারি জেনারেল, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
মাহফুজ আনাম, কোষাধ্যক্ষ, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
এম. হাফিজউদ্দিন খান, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
এ. টি. এম. শামসুল হুদা, সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ (প্রয়াত)
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

প্রচ্ছদ : মোঃ বরকত উল্লাহ বাবু, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরাতন) ২৭
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-34-0189-2

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় 9-১১৮
সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি

২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা ৯
মো. রেযাউল করিম

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ২৪
তাসলিমা আক্তার

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৩৭
নাহিদ শারমীন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় ৪৬
নাহিদ শারমীন ও শাহজাদা এম আকরাম

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৬১
নীনা শামসুন নাহার

বিটিসিএল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৭২
দিপু রায়

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৮১
মনজুর ই খোদা ও জুলিয়েট রোজেটি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ৮৮
মো. শাহ্নূর রহমান ও নাজমুল হুদা মিনা

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প : ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১০৫
মোহাম্মদ হোসেন ও মো. রবিউল ইসলাম

দ্বিতীয় অধ্যায় ১২১-১৬৯
খাতভিত্তিক গবেষণা

স্থানীয় সরকার খাত : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১২১
ফারহানা রহমান, নাহিদ শারমীন ও মো. রবিউল ইসলাম

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৩৭
মোহাম্মদ হোসেন ও নিহার রঞ্জন রায়

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৫৫
মো. শাহ্নূর রহমান

লেখক পরিচিতি ১৭০

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক চারটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চম সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। বিষয় অনুসারে এ সংকলনটি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি নিয়ে সম্পন্ন গবেষণার সার-সংক্ষেপ স্থান পেয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমস হাউসে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের কার্যকরতা, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের ভূমিকা, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে সুশাসনের সমস্যা, রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং ২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার সারাংশ রয়েছে এ অধ্যায়ে।

সংকলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে খাতভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদনের সারাংশ। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার, সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

এই সংকলনটি প্রকাশ করতে টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সহকর্মীরা সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়েছেন। সংকলন গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। টিআইবির সব গবেষণার উপদেষ্টা হিসেবে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিশেষ করে বোর্ডের সাবেক চেয়ারপারসন এম হাফিজউদ্দিন খান এবং বর্তমান চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের অমূল্য অবদানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ, সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদানকারীসহ সকল অংশীজন যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি

২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা*

মো. রেযাউল করিম

১. প্রেক্ষাপট

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠন ও তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবি নিয়ে দেশে সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী যার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার কথা তার সম্পর্কেও দলীয় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়।[১] অব্যাহত বিরোধিতার মুখে তিনি নিজে এই দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন বলে ঘোষণা দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিজেই তার দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন মহাজোট রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন ও ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা ইত্যাদি কারণে ওই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। এমতাবস্থায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। অন্যদিকে 'সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া ওই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না'– এই মর্মে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও রাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করে।[২]

উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেন, যার পেছনে ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের একাংশের ভূমিকা ছিল (আহমেদ, ২০০৯; নিজাম, ২০১০; আখতার, ২০০৯; লেনিন ও জহির, ২০০৯; ইকোনমিস্ট, ৬ নভেম্বর ২০০৮)। ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্যোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে একটি সরকার গঠন করা হয়। যা, 'ওয়ান ইলেভেন' 'বা 'সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবেও পরিচিত। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের মুখে এভাবে

* ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

১ এমন অভিযোগও আনা হয়েছিল যে তাকে সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই চারদলীয় জোট সরকারের সময় বিচারপতিদের অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

২ মিডিয়া রিলিজ (১১ জানুয়ারি ২০০৭), জাতিসংঘ, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়, ঢাকা (সূত্র : লেনিন ও জহির, ২০০৯)।

সরকার পরিবর্তনের ঘটনাকে ‘পূর্বপরিকল্পিত অভ্যুত্থান’ (মজহার, ২০০৯), ‘ক্ষমতা দখল’ (ইকোনমিস্ট, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭) ও ‘রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম সমাধান’[৩] হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করলেও ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ করে (আখতার, ২০০৯; লেনিন ও জহির, ২০০৯: ৩৫৪; ভন ২০০০)। সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন–সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া গতিশীল করার জন্য টাস্কফোর্স গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ ছিল এই সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার।[৪]

রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা ও প্রভাব নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ রয়েছে। হান্টিংটন (১৯৬২ ও ১৯৭৫) সামরিক শাসনকে ‘আধুনিকায়ন’ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা’ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও অনেক গবেষক সামরিক শাসনের সাথে আর্থসামাজিক উন্নয়নের নেতিবাচক সম্পর্কের কথাও বলেছেন (নর্ডলিঙ্গার, ১৯৭০)। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান (১৯৮৭) সামরিক শাসনকে ‘রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা’, ‘জনগণকে বিরাজনীতিকরণ’ (depoliticizing the people) ও ‘রাজনীতিকদের রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার হাতিয়ার’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২০০৭-০৮ সালে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর একাংশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ বেসামরিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।[৫] দুর্নীতিসহ গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০৭ সালের ৮ মার্চ ‘ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি’ (এনসিসি) গঠন করা হয়, যার প্রধান সমন্বয়ক করা হয় সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারকে (পিএসও)।[৬] সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে এনসিসির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, সাতটি মহানগর বা আঞ্চলিক কমিটি ও ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। কমিটিগুলোকে দুর্নীতি ও গুরুতর অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত, চার্জশিট দাখিল, মামলা পরিচালনায় সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান, অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, প্রয়োজনীয় নথি, তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ আইনানুযায়ী জব্দ করা এবং পরোয়ানা ছাড়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

---

৩ প্রেস রিলিজ, ইউ.এস. অ্যাম্বাসি, ১২ জানুয়ারি ২০০৭, ঢাকা।

৪ প্রধান উপদেষ্টা ২০০৭ সালের ২১ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

৫ ধারা ১৩০, ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষ্য, ১৮৯৮; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ইন্স্ট্রাকশন্স রিগার্ডিং এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান ও জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ - এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ, গেজেট নম্বর - স্বম (রাজ-২)/সবাহি/১৮-২০০৭/১৫৬ (২০০৭), ১৭ ফেব্রুয়ারি।

৬ জাতীয় সমন্বয় কমিটি (২০০৭), বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, নম্বর মপবি/ক.বি.শা./উপদেষ্টা পরিষদ-৪/২০০৭/৩৬, কমিটি বিষয়ক শাখা, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮ মার্চ।

দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে অংশ নেওয়া সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের একাংশের এখতিয়ারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে (অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৮; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০০৭ ও ২০০৮; দি সাউথ এশিয়ান, ২০০৮; ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ, ২০০৮; আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০০৮; অধিকার, ২০০৮ ও ২০০৯; আলমগীর, ২০০৯; হোসেন, ২০০৮; ইসলাম, ২০১০; খান, ২০০৯; হক, ২০০৮; সাপ্তাহিক ঠিকানা, ২০০৮ ও প্রবাসী বার্তা ডটকম ২০০৯)। তৎকালীন সেনাপ্রধানও (২০০৯: ৩৬৪) তার নিজের বইয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা

২০০৭ সালে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা ও পরবর্তী দুই বছরে বেসামরিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকা (আহমেদ, ২০০৯; হোসেন, ২০১০), তৎকালীন আইনের শাসন ও ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে পর্যালোচনা, সমালোচনা ও অনুসন্ধাননির্ভর নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও বই প্রকাশিত হলেও বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর নিয়মতান্ত্রিক গবেষণার অভাব রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক সংকট সমাধান ও দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত করা হলেও বাস্তবিকপক্ষে তা সশস্ত্র বাহিনীর জন্যই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট করে। জবাবদিহিহীনভাবে সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক কার্যক্রমে জড়িত হলে কী ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়, তা বিশদভাবে জানতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান দেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো :

১. ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা।

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

৩. সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা।

৪. গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

৪. গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হলো ‘ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার’। এ ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ-সম্পদ অর্জন, প্রতারণা, প্রভাব বিস্তার, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিভিন্ন ধরনের

হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'সশস্ত্র বাহিনীর একাংশ' বলতে ওই সব সদস্যকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সম্পর্কে তথ্যদাতারা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন। এ গবেষণায় ২০০৭-০৮ সালে বেসামরিক প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি সম্পর্কেই শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণাটি গুণবাচক প্রকৃতির হওয়ায় তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো সংখ্যাগত পরিমাপ, মূল্যায়ন ও সাধারণীকরণ করা হয়নি। এ গবেষণায় ব্যক্তিবিশেষের দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। তাই গবেষণাটি কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তমূলক প্রতিবেদন নয়। বর্তমান গবেষণায় দলীয় আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ওই সব ব্যক্তি ২০০৭-০৮ সময়কালে সশস্ত্র বাহিনীর কোনো না-কোনো সদস্য দ্বারা কোনোরূপ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন কি না এবং হয়ে থাকলে দুর্নীতিটি কী ধরনের ছিল শুধু এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৫.১ তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে অনুসৃত প্রক্রিয়া : গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও খাতভুক্ত ব্যক্তি ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু সশস্ত্র বাহিনীর একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার-সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর ও আপেক্ষিক, কাজেই তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে যেসব প্রতিষ্ঠানে টাস্কফোর্স কাজ করেছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়। তারপর ওই তালিকা থেকে সরাসরি জনগণকে সেবা দেয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়। নির্বাচিত এসব প্রতিষ্ঠান ও খাতের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব আলোচনায় সশস্ত্র বাহিনীর একাংশের দুর্নীতি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও অবহিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোট তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্তমান গবেষণায় প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

ক. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার : এক-এগারো-পরবর্তী ঘটনাবলির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত দুই শতাধিক মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তথ্যদাতারা হলেন– সশস্ত্র বাহিনী-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা; সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী; অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ও ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা; বিচারক ও আইনজীবী; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা; রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক; টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও কর্মী; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি; ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ঠিকাদার; সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও খাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী; রাজনৈতিক নেতা-কর্মী; সিবিএ প্রতিনিধি ও অন্যান্য বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি।

খ. দলীয় আলোচনা : একই প্রতিষ্ঠান ও খাত সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য মোট আটটি দলীয় আলোচনা করা হয়। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম বন্দর-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও সিবিএ নেতা, বিভিন্ন নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গণমাধ্যমের কর্মী। মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. কেস স্টাডি : দলীয় আলোচনা ও মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার ওপর ২০টি কেস স্টাডি করা হয়। সংঘটিত ঘটনার ধরন, ব্যাপ্তি, কারণ ও প্রভাব-সংক্রান্ত তথ্য পেতে এসব কেস স্টাডি করা হয়, যার মধ্য থেকে কয়েকটি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত টুল : বিভিন্ন খাত, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও তথ্যদাতার ধরনভেদে ভিন্ন ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য : বাংলাদেশের সংবিধান, সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, আদেশ ও নির্দেশনা পর্যালোচনার পাশাপাশি সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও ঘটনার ওপর প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, নথি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫.২ তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা

এই গবেষণার আওতাভুক্ত একই বিষয়ের ওপর একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই (corroboration) করা হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করতে গুণগত গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পূরকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫.৩ তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়কাল

জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ সময়ের মধ্যে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, তথ্য বিশ্লেষণ, খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদনের ওপর বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

৫.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

১. অনেক ক্ষেত্রে গবেষণায় বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যে অভিগম্যতা পাওয়া যায়নি।

২. অনেক ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান।[৭]

---

[৭] যেমন একজন তথ্যদাতার বক্তব্যে বিষয়টি এভাবে প্রতিফলিত হয় : 'সশস্ত্র বাহিনী সদস্যের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি সম্পর্কে কিছু বললে ভবিষ্যতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে' (সাক্ষাৎকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা গবেষককে একথা বলেন)।

৬. গবেষণার ফলাফল

৬.১ সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা

সংবিধান অনুযায়ী জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত ছয়টি অনুচ্ছেদ, যথা চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার স্থগিত হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ২০০৭ সালে ঘোষিত জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ (১২ জানুয়ারি) ও জরুরি ক্ষমতা বিধিতে (২১ মার্চ) পরোয়ানা ছাড়া যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, জিজ্ঞাসাবাদ, মালামাল ক্রোক ও বিচারের মুখোমুখি করা, দায়েরকৃত মামলার তদন্ত, অনুসন্ধান বা বিচার চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে প্রতিকার চাওয়া, জামিনের আবেদন করার সুযোগ রহিত করা ও কৃতকর্মের জন্য দায়মুক্তি সুযোগ রাখা ইত্যাদি কার্যত সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী ছিল। এসব বিধান বেসামরিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কোনো সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৬.২ সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় গৃহীত ইতিবাচক উদ্যোগ

২০০৭-০৮ সালে সশস্ত্র বাহিনীর একাংশকে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনাসহ বেসামরিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। এসব উদ্যোগের ফলে দেশে প্রথমবারের মতো স্বল্পতম সময়ে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবিসহ ভোটার তালিকা বাস্তবায়ন, চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ও কনটেইনারজট হ্রাস, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও জনদুর্ভোগ হ্রাস, অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি উদ্ধার, অবৈধভাবে নির্মিত বহুতল ভবন উচ্ছেদ করে নগর যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, নগর পরিবেশ উন্নয়নে হাতিরঝিলের মতো প্রকল্পের সূচনা, বকেয়া গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের বিল আদায়, সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচন আয়োজন সম্পন্ন করা ও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে অবদান রাখা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৬.৩ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতি

এক-এগারোর পর একদিকে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার কাজে সম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন, অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কোনো সদস্যের এখতিয়ারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড, অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্যদাতাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত এই গবেষণায় উঠে এসেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন ও প্রক্রিয়ার ওপর প্রাপ্ত তথ্য নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

৬.৩.১ ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ অর্জন

বিধিবহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণ ও আদায় : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কোনো সদস্য পেশাগত পরিচয়, পদবি ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে অবৈধ অর্থ-সম্পদ রয়েছে কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এমন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ

থেকে জোর করে অর্থ আদায় করেছেন। এ ছাড়া বিধিবহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধা, যেমন প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দেওয়া, জামিন প্রাপ্তির ব্যবস্থা, দুদকের দায়েরকৃত মামলায় শাস্তিহ্রাস, দুদকের আদালতে মামলা দায়ের না করা ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায় করা হয় বলে তথ্যদাতারা জানান।

অভিপ্রায় মোতাবেক জমি কেনাবেচায় বাধ্য করা : ঢাকা মহানগরের নিকটবর্তী কয়েকটি উপজেলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির অভিপ্রায় মোতাবেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় নির্ধারিত জমি বিক্রি করতে জমির মালিককে রাজি করানো বা জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। আর জমির মালিক জমি বিক্রি করতে রাজি না হলে কিংবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাদের আটক করে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করার তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া একই কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য কোনো অভিযোগে মামলা দায়ের ও জেলে পাঠানোরও তথ্য পাওয়া গেছে। একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয় টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং বিচারবিহীন অবস্থায় প্রায় এক বছর জেল খেটেছেন বলে জানান।

৬.৩.২ *আইনবহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার কিছু উদাহরণ*

জোর করে টাকা আদায় : সাংবিধানিক[৮] ও আইনি বৈধতা ছাড়াই ভয়ভীতি প্রদর্শন করে দেশের ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে ১ হাজার ২৩২ কোটি টাকা আদায় করা হয়।[৯] ক্ষেত্রবিশেষে জোর করে আদায়কৃত টাকার পুরোটা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে এর একাংশ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে কোনো কোনো তথ্যদাতা অভিযোগ করেন। টাকা আদায়কালে 'অবৈধভাবে সম্পদ হতে স্বপ্রণোদিত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হতে এই টাকা প্রদান করেছি' মর্মে জোর করে মুচলেকা আদায় করা হয় বলেও তথ্যদাতারা জানান।

বিধিবহির্ভূতভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে বার্থ অপারেটর নিয়োগ ও কনটেইনার রাখার চার্জ বৃদ্ধি : গবেষণার তথ্যে দেখা যায়, দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে 'বার্থ অপারেটর' নিয়োগের বিধান থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দরের টাস্কফোর্সের অভিপ্রায় মোতাবেক বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০০৭ সালের ১৬ মে একটি সাধারণ সভা ডেকে বার্থ অপারেটর নিয়োগ করে। এ ছাড়া একই প্রক্রিয়ায় বার্থ অপারেটরদের কনটেইনারের লোডিং বা ডিসচার্জিং ও ডেলিভারি চার্জ দরপত্র ছাড়া বন্দর কর্তৃপক্ষ বাড়াতে বাধ্য হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম বন্দরে অটোমেশন প্রক্রিয়া প্রবর্তনে অনিয়ম : বন্দর কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বন্দর বিধিমালা অনুসরণ না করে টাস্কফোর্সের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোনো দরপত্র ছাড়া একটি কোম্পানিকে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর দায়িত্ব দেয়।

---

[৮] বাংলাদেশের সংবিধান অনুচ্ছেদ ৫৮ (খ-ঙ), ৮১, ৮২ ও ৮৩।

[৯] *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (৩০ এপ্রিল ২০১১); *বাংলাদেশ প্রতিদিন* (১১ জানুয়ারি ২০১২)।

৬.৩.৩ *মানবাধিকার লঙ্ঘন*

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্যাতন : মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউপির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ধরে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখে কিংবা স্থানীয় ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও হুমকি দিয়ে অভিপ্রায় মোতাবেক কাজ আদায় করে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের কাজের মধ্যে ছিল জমিজমা ও বিরোধ নিষ্পত্তি, স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রব্য ও বস্তুগত জোগান, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, জমিজমা কেনাবেচা-সংক্রান্ত কাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া কোনো কোনো তথ্যদাতা তাদের পরিবারের সদস্য বা সহকর্মী নির্যাতনে মারা যান এমন দাবিও করেন (দেখুন : কেস ১)।

রাজনীতিকদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানি : জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন যেমন–আটককৃত দলীয়প্রধানের মুক্তির বিষয়ে দুই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, জরুরি অবস্থায় সৃষ্ট নতুন দল বা ফ্রন্টে যোগদান কিংবা একাত্মতা প্রকাশে রাজনীতিবিদদের কাছে প্রস্তাব পেশ, প্রলোভন দেওয়া ও চাপ প্রয়োগ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সেই লক্ষ্যে দ্রুত বিচার আদালতে মামলা দায়ের, আটক ও বিচারে প্রভাব সৃষ্টি, একজন রাজনৈতিক নেতাকে দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধা দান ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের ওপর নির্যাতন : গবেষণায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচয়দানকারী ব্যক্তিদের হাতে ব্যবসায়ীদের একাংশ বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হন বলে জানা যায়। এসব নির্যাতনের মধ্যে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা, আটকাবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন, জোর করে দোকান, ফ্ল্যাট ও প্লটের মালিকানা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে বাজারমূল্যের কমে হস্তান্তর বা বিক্রি করতে বাধ্য করা, বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার কথা বলে নির্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য করা, মজুতদারির অভিযোগে নোটিশ ছাড়া খাদ্যদ্রব্যসহ গুদাম সিলগালা করা, দুর্নীতির অভিযোগ এনে ব্যাংকের হিসাব জব্দ করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গ্রেপ্তার এড়ানো, আটকাবস্থা থেকে মুক্তি, দ্রুত জামিন, নির্যাতন এড়ানোর জন্য অর্থ প্রদান করা হয় বলেও কোনো কোনো তথ্যদাতা জানান।

আইনি সহায়তাপ্রত্যাশীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন : জরুরি বিধিমালা ভঙ্গ ও জরুরি অবস্থায় দুদকের দায়েরকৃত মামলার আসামি এমন ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রদত্ত তথ্য মতে, আসামির

> কেস ১ : পরিবারের সদস্য, সহকর্মী ও আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালের জানুয়ারির শেষাংশে একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে আটক করে স্থানীয় ক্যাম্পে নিয়ে মারধর করে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেখে আসা হয়। হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় ওই রাতেই তার মৃত্যু হয়। লাশ দাফনের পর প্রায় এক মাস পর্যন্ত কাউন্সিলরের কবর ও বাড়ি সশস্ত্র বাহিনী পাহারায় রাখে। এর পাশাপাশি বেসামরিক পোশাকে অপরিচিত ব্যক্তিরা বাসায় গিয়ে কাউন্সিলরের স্ত্রীকে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কোনো প্রকার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে চাপ সৃষ্টি করে। আর এর অন্যথা হলে স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও দুই কন্যারও একই পরিণতি হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পরিবার ও তাদের সহায়তাকারীদের ওপর বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়। তথ্যদাতাদের মতে, টেলিফোন করে মামলায় সহায়তা না করতে পরামর্শ দেওয়া, টেলিফোনের আলাপ রেকর্ড করা ও চলাফেরা অনুসরণ করার কথা জানানো ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের চাপের মুখে রাখা হতো। যেন তারা আসামিদের সহায়তা দিতে নিরুৎসাহিত হন। তথ্যদাতারা জানান, টেলিফোনে এসব ব্যক্তি নিজেদের টাস্কফোর্সের সদস্য বলে দাবি করতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন : ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া আটক করার পর তাদের আদালতে সোপর্দ না করে অজ্ঞাত স্থানে আটক রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে কয়েকজন নির্যাতিত শিক্ষক জানান। উল্লেখ্য, এভাবে আটক রাখা সংবিধানে বিধৃত মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১০]

থানা হেফাজতে শারীরিক নির্যাতন : অনেক ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে মোতায়েনকৃত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য কর্তৃক থানা হেফাজতে থাকা বেসামরিক ব্যক্তিকে থানার ভেতরে প্রবেশ করে। শারীরিকভাবে নির্যাতন করে প্রয়োজনীয় জবানবন্দি আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজমান থাকায় এসব ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে সাহস পাননি বলে থানা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাবি।

৬.৩.৪ প্রভাব বিস্তার

আইনজীবীদের কার্যক্রম : তথ্যদাতাদের মতে, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের সময় দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত দুর্নীতির মামলাগুলো বিবাদীর পক্ষে পরিচালনা না করার জন্য আইনজীবীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হয় এবং পেশাগত দায়িত্ব ও স্বাধীনতা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।

প্রক্রিয়া না মেনে দ্রুত বিচার : দ্রুত বিচার আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় (তদন্ত, মামলা দায়ের ইত্যাদি) সশস্ত্র বাহিনীর একাংশ ও সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্সের সদস্যরা বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেন বলে এ গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, টাস্কফোর্স যথাযথভাবে তদন্ত না করে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়া করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করতে তদন্তকারী কর্মকর্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এসব মামলার বিবাদীদের মধ্যে যারা পলাতক ছিলেন, তাদের অনেকেই সম্পদের হিসাব সময়মতো জমা দিতে পারেননি। আবার কেউ তাড়াহুড়া করে হিসাব দাখিল করে আত্মগোপন করেন। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকে কোনো নোটিশই পাননি। ইসলামের (২০১০ : ১৬৫) মতে, টাস্কফোর্স সাধারণত অভিযোগপত্রের খসড়া তৈরি করার পর তা দুদক কর্মকতাদের কাছে হস্তান্তর করতেন। এরপর অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর আদায় করে নেওয়ার পাশাপাশি দুদক কর্মকর্তাদের দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও চার্জশিট দাখিল করতে বাধ্য করত। সার্বিকভাবে শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের যে দ্রুততার সাথে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং এরপর দীর্ঘদিন জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে, আবার যেভাবে দ্রুততার সাথে

[১০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৩৩ (১)।

প্যারোল বা জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে, এর ফলে সত্যিকার অর্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিচার করতে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হলো কি না, তা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।[১১]

সুপ্রিম কোর্ট ও ঢাকা বারের নির্বাচন : ঢাকা ও সুপ্রিম কোর্ট বারের সংবিধান অনুযায়ী এ দুটি বারের নির্বাচন যথাক্রমে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও চাপের মুখে ২০০৭ সালে এ দুটি নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। একজন আইনজীবীর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ আইনজীবী প্যানেল নির্বাচনে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে বলে এই নির্বাচন পেছানো হয়।

জেলখানায় ডিভিশন প্রাপ্তি : কারাবিধি মোতাবেক জরুরি অবস্থায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কারাগারে আসার পর ডিভিশন পাওয়ার যোগ্য তারা তা পাবেন কি না, তা অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করত বলে তথ্যদাতারা অভিমত দেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষকদের আটক করার পর জেল কোড অনুসরণ না করে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ডিভিশন দেওয়া হয়নি।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড : জরুরি অবস্থায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা[১২] নিষিদ্ধ থাকলেও 'সংস্কারপন্থী' হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামরিক প্রভাব ছিল বলে রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে জানা যায়। জরুরি অবস্থায় আবির্ভূত একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাজধানীর হোটেলে সমবেত হয়ে রাজনৈতিক আলোচনা ও গণমাধ্যমে বিবৃতি দেওয়া, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের সংস্কারপন্থীদের পরস্পরের সাথে আলোচনা, ঘরোয়া বৈঠক ও গণমাধ্যমে রাজনৈতিক বিবৃতি দেওয়ার ঘটনা ঘটলেও এসব কর্মকাণ্ডে কোনো ধরনের বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। এ ছাড়া ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে জরুরি অবস্থায় সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক দলকে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাসহ ত্রাণ বিতরণ কাজেও বাধা দেওয়া হয়নি (আখতার, ২০০৯: ১২৭)। এসব ঘটনা কোনো কোনো বিশেষ ধারার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামরিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

আটক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিচারিক প্রক্রিয়া : জরুরি অবস্থায় আটক ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর একাংশ প্রভাব বিস্তার করে বলে আটক শিক্ষকদের কেউ কেউ জানান। শিক্ষকদের সাজা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মওকুফ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষক বলেন, 'মামলাগুলো ছিল প্রসহনমূলক। রাষ্ট্রপতির সাজা মওকুফ ছিল উচ্চ সামরিক পর্যায়ের একাংশের একটা কৌশল। এটার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে, চাইলে যে কাউকে তারা শাস্তি দিতে পারে, আবার ক্ষমাও করতে পারে।'[১৩]

---

[১১] ইফতেখারুজ্জামান (২০০৮) 'দুর্নীতি প্রতিরোধের ভবিষ্যৎ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জানুয়ারি।

[১২] *জরুরি ক্ষমতা আইন*, ২০০৭, ধারা ২।

[১৩] অভিযুক্ত একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সাক্ষাৎকার।

৬.৩.৫ *গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ*

'জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭' ও 'জরুরি ক্ষমতা বিধি, ২০০৭'-এর মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যম তথা গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় জরুরি ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার তথ্যমতে, তৎকালীন তথ্য উপদেষ্টা গণমাধ্যমের প্রধানদের তার কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে গণমাধ্যমের করণীয় সম্পর্কে বলেন, 'বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে আমরা চাইলে সবকিছু করতে পারি। এমন কিছু প্রচার করা যাবে না যা দেশের রাজনীতিবিদদের পক্ষে যায়। আর এমন কিছু দেওয়া যাবে না যা সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে যায়।'[১৪]

যেসব উপায়ে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করা হয় : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যেসব উপায়ে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

- সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকান্ডের ওপর নির্মিত বা ধারণকৃত ভিডিও চিত্র, সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রচারের আগে দেখানো কিংবা অনুলিপি দিতে চাপ প্রয়োগ।
- রাজনীতিকদের নেতিবাচক কর্মকান্ড ও তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের বিবরণী-সংক্রান্ত তথ্য ও নথি সংগ্রহ করে তা প্রচার করতে চাপ প্রয়োগ।
- ক্ষেত্রবিশেষে জরুরি অবস্থায় আটক ব্যক্তিদের জবানবন্দির অডিও ক্যাসেট ও সিডি প্রচারের নির্দেশ।
- অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের কর্মীদের গতিবিধির ওপর নজরদারি।
- নির্দেশনা উপেক্ষা করে সংবাদ ও ছবি প্রচার করায় কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সংবাদকর্মীকে চাকরিচ্যুত করা।
- কয়েকটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদনবিষয়ক প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা ও ক্ষেত্রবিশেষে মালিকপক্ষের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মালিকানা পরিবর্তনে চাপ সৃষ্টি।

যেসব বিষয় প্রচার বা প্রকাশের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় : তথ্যদাতাদের মতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রচার বা প্রকাশ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল :

- দেশে-বিদেশে সশস্ত্র বাহিনীর ইতিবাচক কর্মকান্ড ও সাফল্য
- রাজনীতিকদের নেতিবাচক কর্মকান্ড ও তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের বিবরণী
- সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের তালিকা
- নির্যাতন করে আদায় করা জবানবন্দির ওপর তৈরি অডিও ক্যাসেট ও সিডি
- ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের পর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের চিত্র।

যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় : তথ্যদাতাদের মতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রচার বা প্রকাশ না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল :

---

[১৪] একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার (১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

- সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীর সমালোচনামূলক সংবাদ, ছবি, কার্টুন, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, টক শো, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ, মন্তব্য, প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধনবিষয়ক সংবাদ
- সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের কোনো ধরনের অনিয়ম কিংবা বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের ওপর তথ্য বা সংবাদ
- ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য ও সংবাদ ।

৬.৩.৬ *অন্যান্য*

জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামরিক বাহিনী দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হলেও ওই প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠপর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান । উদাহরণস্বরূপ, ভোটার আইডির ক্যাম্পের জন্য কিছু আসবাব, নাস্তা ও খাবার, এ কাজে সহায়তার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান ইত্যাদি বাবদ খরচ ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের চেয়ারম্যান, মেম্বার বা মেয়র ও কাউন্সিলরকে বহন করতে বাধ্য করা হয় বলে কোনো কোনো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি দাবি করেন । তবে এসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তারা বলেন, এ ধরনের কোনো দুর্নীতি হয়নি । যদি ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কিছু দিয়েও থাকে তাহলে তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই দিয়েছে, জোর করে কিছু নেওয়া হয়নি । অপরপক্ষে একজন কাউন্সিলরের ভাষ্যমতে, একটি সিটি করপোরেশনের মেয়র ও সব কাউন্সিলরকে স্থানীয় সেনাক্যাম্পে ডেকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তা তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘এটা আপনাদের কাজ, খরচ কীভাবে ও কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন আমরা তা জানি না, এসব ম্যানেজ করে নেবেন ।’[১৫] ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের ব্যয় বহন করেছেন বলে কয়েকজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানান ।

৬.৪ অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব

পেশাদারত্বের ক্ষতি : দীর্ঘদিন ব্যারাকের বাইরে অবস্থানের কারণে সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নির্ধারিত প্রশিক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে । কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ও সামরিক বিশ্লেষকের মতে, এতে সংশ্লিষ্ট সামরিক সদস্যদের পেশাদারত্বের ক্ষতি হয়েছে । এ বিষয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা বলেন, ‘এক-এগারোর পর সামরিক ব্যারাক ছেড়ে বেসামরিক কাজে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পৃক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সেনাসদস্যদের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । টাস্কফোর্স ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকেই নিজেদের সংযত রাখতে পারেনি ।’

বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আদালত প্রাঙ্গণে অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতির কারণে দুদকের দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে বিচারক ও আইনজীবীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ব্যাহত হয় । নিম্ন ও উচ্চ আদালতে দুদকের মামলার বিচারকার্যক্রমে (মামলা দায়ের, তদন্ত, চার্জশিট দাখিল, সাক্ষী হাজির করা-না করা ইত্যাদি) হস্তক্ষেপ করায় ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন ব্যাহত হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান ।

[১৫] একজন কাউন্সিলরের সাক্ষাৎকার (৯ এপ্রিল ২০১০) ।

জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া : ২০০৭-০৮ সালে বিভিন্ন সময় জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন হবে এমন সংবাদ ও তথ্য গণমাধ্যমে প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এতে অনেক বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তি থেকে জনগণ বঞ্চিত হয়।

৭. সুপারিশমালা

১. ***সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করা :*** যে পরিপ্রেক্ষিতে এক-এগারোর সৃষ্টি হয় তার পুনরাবৃত্তি এড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক সংঘাত এড়িয়ে সব পক্ষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ তৈরি না হয়।

২. ***শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ওপর তথ্য প্রকাশ :*** অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সে বিষয়ের ওপর তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা থাকলে তা দূর করে আইনি সংস্কার করতে হবে।

৩. ***বেসামরিক কাজে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহার সীমিত করা :*** বেসামরিক কাজে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার সীমিত করতে হবে। একই সাথে বেসামরিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. ***দায়মুক্তির সুযোগ আইনত নিষিদ্ধ করা :*** সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দায়মুক্তির বিধান আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫. ***অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা :*** যেকোনো পরিস্থিতিতে অবাধ তথ্যপ্রবাহ তথা গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও নির্ভয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. ***সদিচ্ছা ও দায়িত্বশীল আচরণ :*** সার্বিকভাবে বলা যায় সুশাসনের জন্য এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভব কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন ও জবাবদিহি ছাড়া প্রকৃত দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের বিকল্প সামরিক হস্তক্ষেপ নয়। গণতন্ত্রের বিকল্প বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটি আরও উন্নততর গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই সামরিক হস্তক্ষেপ নয়, রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সব পক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দায়িত্বশীল আচরণই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অধিকার (২০০৭ ও ২০০৮) *হিউম্যান রাইটস রিপোর্ট*, ঢাকা।

আখতার, মু. ই. (২০০৯) *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমী নির্বাচন*, ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

আহমেদ, ম. ইউ. (২০০৯) *শান্তির স্বপ্নে : সময়ের স্মৃতিচারণ*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন ।

আলমগীর, ম. খ. (২০০৯) *নোটস্ ফ্রম এ প্রিজন : বাংলাদেশ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট (জানুয়ারি ২০০৮) ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (২০০৭ ও ২০০৮) *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ, ঢাকা ।*

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ গেজেট, *জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ (২০০৭) অতিরিক্ত সংখ্যা*, অধ্যাদেশ নম্বর ১/২০০৭, ১২ জানুয়ারি ।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, জরুরি ক্ষমতা বিধি (২০০৭) অতিরিক্ত সংখ্যা, ২১ মার্চ ।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (২০০৮) *রেস্টোরিং ডেমোক্রেসি ইন্ বাংলাদেশ, এশিয়া রিপোর্ট*, নম্বর ১৫১, ২৮ এপ্রিল ।

ইসলাম, মো. এম. (২০১০) *১/১১'র একজন বন্দীর কথা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন রিপোর্ট (২৪ এপ্রিল ২০০৮) ।

কমিটি বিষয়ক শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় সমন্বয় কমিটি (২০০৭), বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (২০০৭) নম্বর মপবি/ক.বি.শা./উপদেষ্টা পরিবষদ-৪/২০০৭/৩৬, ৮ মার্চ ।

খান, এম. স. র. (২০০৯) *অন্ধকারার বন্দী বিবেক : রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (২০০০) ।

নর্ডলিঙ্গার, ই. এ. (১৯৭০), 'সোলজার ইন মুফতি : দ্য ইমপেক্ট অব মিলিটারি রোল আপন ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন নর্থ-ওয়েস্টার্ন স্টেট ।' *আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ*, ৬৪(৪), ডিসেম্বর : ১১৩১-৪৮ ।

নিজাম, ন. (২০১০) *ওয়ান ইলেভেনে বঙ্গভবন ট্রাজেডি*, ঢাকা : অন্বেষণা প্রকাশন ।

মনিরুজ্জামান, টি. (১৯৮৭), *মিলিটারি উইথড্রোয়াল ফ্রম পলিটিকস : এ কমপ্যারাটিভ স্টাডি*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।

হোসেন, মো. আ. (২০১০) *গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ।

হোসেন, মো. আ. (২০০৮) *কাঠগড়ায় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় : রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ।

হোসেন, ম. (২০১০) *গণতন্ত্রের সাফল্য চাহিয়াছি*, ঢাকা : সিটি পাবলিশিং হাউস লিমিটেড ।

লেলিন, রে. র. এবং জহির, ম. (সম্পাদিত সংকলন) (২০০৯) *জরুরি অবস্থা : রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, ঢাকা : ঐতিহ্য ।

হান্টিংটন, প. স. (১৯৭২), 'পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকেল ডিকে', *ওয়ার্ল্ড পলিটিকস*, ১৭(৩), এপ্রিল : ৩৮৬-৪৩০.

হান্টিংটন, প. স. (১৯৭৫), *পলিটিক্যাল ওর্ডার ইন চেঞ্জিং সোসাইটিজ*, নিউ হ্যাভেন : ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস ।

হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, ২০০৭ ও ২০০৮, http://www.hrw.org/ ।

দ্য সাউথ এশিয়ান (ওয়াশিংটন) (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইন্সট্রাকশন রিগার্ডিং এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার।
প্রবাসী বার্তা ডটকম (২০০৯), নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষ্য (১৮৯৮)।

রাজনৈতিক শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান ও জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭-এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ, নম্বর-স্বম (রাজ-২)/সবাহি/১৮-২০০৭/১৫৬ (২০০৭), ১৭ ফেব্রুয়ারি।

সাপ্তাহিক ঠিকানা (২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮), নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

তাসলিমা আক্তার

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

চিকিৎসাসেবা প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় তিনটি পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তৃতীয় পর্যায়ের প্রধানতম সরকারি হাসপাতাল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ হাজার ২৮০ রোগী এ হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ থেকে চিকিৎসাসেবা নেয়; বহির্বিভাগ থেকে গড়ে প্রায় ৪ হাজার, জরুরি বিভাগ থেকে গড়ে প্রায় ৭৮০ ও অন্তর্বিভাগে প্রতিদিন রোগী ভর্তি থাকে গড়ে প্রায় ২ হাজার ৫০০। সম্প্রতি ১ হাজার ৭০০ শয্যা থেকে ২ হাজার ৩০০ শয্যায় উন্নীত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর গড় অবস্থানের সময় প্রায় ২ দশমিক ৫৩ দিন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৬ সালে 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : ডায়াগনস্টিক স্টাডি' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে এ হাসপাতালে রোগীদের বিনা মূল্যের সরকারি ওষুধ না পাওয়া, চিকিৎসক দ্বারা ব্যক্তিগত চেম্বারে যাওয়ার পরামর্শ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাবদ রসিদের অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ, দালাল দ্বারা হয়রানি প্রভৃতি দুর্নীতি ও অনিয়মের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়।[১৬] গবেষণা-পরবর্তী সময়ে টিআইবি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষে ২০০৮-এর ১৭ জুন থেকে ২০১৩-এর ৩০ জুন পর্যন্ত হাসপাতালের বহির্বিভাগের তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেখানে ৬৬ হাজার ৮৫৫ জনকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যেমন– গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নাগরিক সনদ স্থাপন, হাসপাতালের সেবাসংক্রান্ত তথ্য প্রচার, অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন, অভ্যন্তরীণ মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে ওয়ার্ড পরিদর্শন, হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আগের তুলনায় বৃদ্ধি, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, নতুন যন্ত্র ক্রয়, নতুন ওয়ার্ড চালু ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। হাসপাতালের সম্প্রসারিত ইউনিট-২-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও হাসপাতালের প্রশাসন

* ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[১৬] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি', ২০০৬।

ও চিকিৎসাসেবায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানা যায়। হাসপাতালে বর্তমানে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও এর কারণ অনুসন্ধানে এবং টিআইবি কর্তৃক গৃহীত ২০০৬-এর উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুশাসন ও সেবার মানোন্নয়নে অব্যাহত সম্পৃক্ততা ও প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিদ্যমান সুশাসনের অগ্রগতি চিহ্নিত করা, সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. হাসপাতাল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
২. হাসপাতাল প্রদত্ত সেবায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
৩. হাসপাতালের প্রশাসন ও চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ অনুসন্ধান করা; এবং
৪. সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের সময়

এ গবেষণাটি গুণগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে একটি দলীয় আলোচনা, বিভিন্ন সময়ে হাসপাতাল সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা। প্রত্যক্ষ তথ্য উৎস হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারী রোগী ও রোগীর আত্মীয়, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক, নার্স, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি, দালাল, ঠিকাদার ও পাইকারি বিক্রেতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ।

২০১০-এর এপ্রিল থেকে ২০১৩-এর আগস্ট পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন ২০১৩ সালের ২৪ আগস্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে তাদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সামনে ১৪ সেপ্টেম্বর আরও একবার উপস্থাপন করার পর পুনরায় তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়। উল্লেখ্য, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল হাসপাতালের সব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ অবকাঠামো, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

স্থানের অভাব : হাসপাতালে মোট ২৯টি বিভাগ ও ৫৩টি ওয়ার্ড থাকলেও রোগীর সেবাদান ও

যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে তা পর্যাপ্ত নয়। যেমন, হেমাটোলজি বিভাগে স্থান স্বল্পতার কারণে যন্ত্রপাতির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনি রোগীর চিকিৎসা কার্যক্রমেও সমস্যা হচ্ছে।

শয্যা : হাসপাতালে ১ হাজার ৭০০ শয্যার বিপরীতে দৈনিক রোগী ভর্তি থাকে গড়ে প্রায় ২ হাজার ৫০০। তবে সম্প্রতি এটি ২ হাজার ৩০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।

আইসিইউ : হাসপাতালটিতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (আইসিইউ) একটি এবং এতে শয্যাসংখ্যা ২০টি, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

অপারেশনকক্ষ : একটি কমপ্লেক্সে ১২টি সহ বিভিন্ন বিভাগের সাথে সংযুক্তি দিয়ে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৯টি অপারেশনকক্ষ আছে। তবে এনেসথেটিস্ট সংকটের কারণে সবগুলো অপারেশনকক্ষ পর্যাপ্ত ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাই অপারেশনের জন্য রোগীদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়, যা রোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

যন্ত্রপাতি : হাসপাতালে এক্স-রে যন্ত্র ছয়টি। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ জন রোগীর এক্স-রে করানো হলেও চাহিদা থাকে গড়ে প্রায় ৩৫০ জনের। বহির্বিভাগে বেলা দুইটা পর্যন্ত সিরিয়াল অনুসারে এক্স-রে করানোর কথা বলা হলেও দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক্স-রে করানো হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৮০ জন রোগীর আলট্রাসনোগ্রাম করানো হলেও চাহিদা থাকে গড়ে প্রায় ২০০ জনের। প্রতিদিন গড়ে ১০ জন রোগীর এমআরআই করানো হলেও চাহিদা থাকে গড়ে প্রায় ২০ জনের। একটি নতুন মেমোগ্রাফি যন্ত্র কেনা হলেও দক্ষ জনবলের অভাবে এটি চালু করা হয়নি।

অ্যাম্বুলেন্স : অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে পাঁচটি। অন্তর্বিভাগ ও জরুরি বিভাগ থেকে দৈনিক সেবা নেওয়া প্রতি ৬৫৬ জন রোগীর জন্য অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে একটি।

ট্রলি : জরুরি বিভাগের জন্য ট্রলি রয়েছে ৬৪টি (প্রতি ১২ জন রোগীর জন্য একটি ট্রলি)। এ ছাড়া হাসপাতালের প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে মোট ৫৬টি ট্রলি আছে।

টয়লেট : হাসপাতালের বহির্বিভাগে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট নেই; বহির্বিভাগে পাবলিক টয়লেট নেই।

অন্যান্য সমস্যা : হাসপাতালে লিফট রয়েছে পাঁচটি; যা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার মোট ৪৩৭টি। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সিলিন্ডারের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়েনি। এর মধ্যে কিছু সিলিন্ডার সঠিকভাবে কাজ করছে না। বহির্বিভাগে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা নেই; যদিও জরুরি বিভাগে এ সুবিধাটি উপস্থিত।

২.২ আবাসনব্যবস্থা

সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা[১৭] অনুযায়ী উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি মানা হয় না।

চিকিৎসক : চিকিৎসকদের থাকার জন্য হাসপাতাল সংলগ্ন ডরমেটরিতে সিট রয়েছে ৪৫টি। অথচ হাসপাতালে নির্ধারিত পদের বিপরীতে চিকিৎসক রয়েছেন মোট ২৪৯ জন (রেজিস্ট্রার ৫০, সহকারী রেজিস্ট্রার ৮৮ ও মেডিকেল অফিসার ১১১ জন)। অর্থাৎ প্রতি ছয়জন চিকিৎসকের বিপরীতে সিট রয়েছে একটি।

নার্স : নার্সদের জন্য পৃথক আবাসন-সুবিধা নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত আবাসন পুলে (মিরপুর, আজিমপুর ও এজিবি কলোনি) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত প্রায় ১৪০ জন নার্স থাকার সুযোগ পান। অথচ হাসপাতালে এই শ্রেণির মোট নার্স রয়েছেন ৬২২ জন।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৃতীয় শ্রেণিতে ফ্ল্যাট অনুপাতে (৪৪টি) কর্মচারীর সংখ্যা (অনুমোদিত ১৮২ জন) চার গুণ। চতুর্থ শ্রেণিতে অনুমোদিত কর্মচারী রয়েছে ৯২৮ জন এবং ফ্ল্যাট রয়েছে ৩৮০টি। ফ্ল্যাট অনুপাতে কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ। ফলে বাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কারণে অর্থ লেনদেনের সুযোগ তৈরি হয়। বাসা বরাদ্দের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাকে ঘুষ দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ দেওয়া হয়নি বলেও জানা যায়।

২.৩ জনবল-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসক ও রোগীর অনুপাতের তারতম্য : হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত মোট ২৯৮ জন চিকিৎসকের মধ্যে রোগীর সার্বক্ষণিক প্রত্যক্ষ সেবায় নিয়োজিত ১৯৯ জন। হাসপাতালে প্রতি ৩৭ জন রোগীর জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন; অন্তর্বিভাগে প্রতি ১৯, বহির্বিভাগে প্রতি ৮০ ও জরুরি বিভাগে প্রতি ৫২ জন রোগীর জন্য একজন করে চিকিৎসক। বহির্বিভাগের কিছু বিভাগে চিকিৎসক এবং রোগীর গড় অনুপাতে পার্থক্য আরও বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। যেমন মেডিসিন ও নাক কান গলা বিভাগে যথাক্রমে প্রতি ১৫০ ও ২০০ জনের জন্য একজন চিকিৎসক।

নার্স ও রোগীর অনুপাতের তারতম্য : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত মোট ৬২৫ জন নার্সের মধ্যে রোগীর সার্বক্ষণিক প্রত্যক্ষ সেবায় নিয়োজিত নার্স ৫৯১ জন। প্রতি ১২ জন রোগীর জন্য একজন করে নার্স; অন্তর্বিভাগে প্রতি পাঁচজন, বহির্বিভাগে ১৩৮ জন ও জরুরি বিভাগে ৪৯ জনের জন্য একজন নার্স। অন্তর্বিভাগের মেডিসিন বিভাগের একটি ওয়ার্ডে ৬০ জন রোগীর দায়িত্বে নার্স দুজন ও নিওরোসার্জারি বিভাগের একটি ওয়ার্ডে ২৫০ জন রোগীর জন্য নার্স দুজন।

[১৭] সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা, নীতি-৫। ক) চাকরির কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ; খ) যদি সরকারি কর্মচারীর চাকরির দৈর্ঘ্য একই রকম হয় সেই ক্ষেত্রে যে কর্মচারী উচ্চতর বেতন গ্রহণ করেন তিনি জ্যেষ্ঠ বিবেচিত হবেন; গ) যদি চাকুরির দৈর্ঘ্য একই রকম হয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বয়সের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী : তৃতীয় শ্রেণিতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ ১১ দশমিক ৫ শতাংশ ও চতুর্থ শ্রেণিতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। হাসপাতালে ২ হাজার ৫০০ রোগীর তিনবেলা খাবার তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত বাবুর্চি রয়েছেন ২০ জন। প্যাথলজিক্যাল সেন্টারে প্রতিদিন সেবা নেওয়া রোগীর সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩০০, যেখানে টেকনিশিয়ান মাত্র ১২ জন।

২.৪ নিয়োগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির অনুমোদিত ১৭১ পদের বিপরীতে ৩৫৪ জনকে নিয়োগ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। যাদের নিয়োগ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছিল তাদের জন্য হাসপাতালে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি এবং চিকিৎসকরা সুপারিশ করেন। নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নিয়োগের জন্য অর্থ দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন, তাদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১ লাখ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগে সরকার নির্ধারিত কোটা; যেমন- জেলা, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা ও নারী কোটা মানা হয়নি। নিয়োগপত্রের ফটোকপি করে অর্থের বিনিময়ে তা বিতরণ করা হয়। নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে নিয়োগ বাতিল করায়[১৮] কর্মচারীরা আদালতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

২.৫ হাসপাতাল প্রদত্ত সেবায় চ্যালেঞ্জ

২.৫.১ *চিকিৎসকের সেবা*

রোগীকে অন্য ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ : উন্নত চিকিৎসার কথা বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীকে চিকিৎসকেরা ব্যক্তিগত চেম্বার বা ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসকের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি : চিকিৎসকের সাথে মেডিকেল প্রতিনিধিদের সাক্ষাতে নির্দিষ্ট সময় (প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত) থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে মেডিকেল প্রতিনিধিরা সুযোগ বুঝে যেকোনো সময় চিকিৎসকের কক্ষে প্রবেশ করছেন। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের দিক থেকেও প্রশ্রয় রয়েছে।

নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ : হাসপাতালের যন্ত্র নষ্ট, পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময় শেষ ইত্যাদি কথা বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীদের হাসপাতালের বাইরের নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে হাসপাতালের কিছু কর্মচারী জড়িত।

চিকিৎসকের উপস্থিত না থাকা : বহির্বিভাগের কিছু কিছু ইউনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের অনেকেই নির্ধারিত সময়ের (সকাল আটটা থেকে বেলা আড়াইটা) পরে আসেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই হাসপাতাল ত্যাগ করেন। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী রোগীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসক না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

---

[১৮] স্মারক নং-স্বাপকম/প্রশা-১/এডি/পদ (কমিটি)-৪/২০০৫/৭৭৪।

২.৫.২ *নার্স ও কর্মচারীর সেবা*

রোগীরা তাদের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে নার্স ও ওয়ার্ডবয়কে ডেকে পান না। কিছু রোগীর জরুরি প্রয়োজনে তাদের ডাকা হলেও তারা আসেন না। অনেক নার্সের বিরুদ্ধে রোগীর সাথে খারাপ আচরণ করারও অভিযোগ রয়েছে।

২.৫.৩ *পথ্য*

দরপত্র বাতিল : ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পথ্যের দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য নয় বলে জমা দেওয়া দরপত্রগুলো বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়। পরে যে দরপত্র গ্রহণ করা হয়, সেটিতে বাজারমূল্যের সাথে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায়।

দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের সাথে বাজারদরের অসামঞ্জস্যতা : ঠিকাদার কাজ পাওয়ার জন্য সবচেয়ে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করেন, কিন্তু কাজ পাওয়ার পর দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পথ্যসামগ্রী কিনতে পারেন না। ফলে ঠিকাদার মেন্যু অনুযায়ী সঠিক মানের ও সঠিক পরিমাণের পথ্য সরবরাহ করতে পারেন না।

ঠিকাদারের বিল পাসে অর্থ প্রদান : হাসপাতালে পথ্যের দ্রব্যাদি সরবরাহের মূল্যছাড় করাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ দিতে হয়।

পথ্যের অপচয় : খাদ্য বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের মতে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ রোগী হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা পথ্য গ্রহণ করেন না।

দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের সাথে বাজারদরের অসামঞ্জস্যতা : ঠিকাদার কাজ পাওয়ার জন্য সবচেয়ে কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করেন কিন্তু কাজ পাওয়ার পর দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পথ্যসামগ্রী কিনতে করতে পারেন না। ফলে ঠিকাদার মেন্যু অনুযায়ী সঠিক মানের ও সঠিক পরিমাণের পথ্য সরবরাহ করতে পারেন না।

ঠিকাদারের বিল পাসে অর্থ প্রদান : হাসপাতালে পথ্যের দ্রব্যাদি সরবরাহের মূল্যছাড় করাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ দিতে হয়।

পথ্যের অপচয় : খাদ্য বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের মতে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ রোগী হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা পথ্য গ্রহণ করেন না।

২.৫.৪ *ওষুধ বিতরণ*

সব ধরনের ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী হাসপাতাল থেকে না পাওয়া : চিকিৎসকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীরা সব ধরনের ওষুধ হাসপাতাল থেকে পান না। এর মধ্যে রয়েছে নিমোকেল, পারকিনিল, পেরিডল, রেমোরিল, ইনজেকশন (ফ্লুকোজ, ফিভেক্লো), ৫০ সিসি সিরিঞ্জ, ইনফিউশন ইত্যাদি।

ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী সরিয়ে রাখা : অন্তর্বিভাগের রোগীদের জন্য ইনডেন্ট অনুযায়ী স্টোর থেকে আনা ওষুধ[১৯] ও চিকিৎসাসামগ্রী রোগীকে না দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়। টেপ, ক্যানোলা, টিউব, রোগীর দেহে খাবার প্রবেশের পাইপ, সেলোরাইড শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ চুরি করে তা হাসপাতালে ভর্তি রোগীর কাছেই বিক্রি করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে হাসপাতালে কর্মরত কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট নার্স, ওয়ার্ডবয় ও দালাল জড়িত।

২.৫.৫ *অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা*

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে রোগীরা বিভিন্ন সেবা পেতে হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রতার শিকার হন। যেমন- সরকারি অ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া, শয্যা না পাওয়া বা ট্রলির সুবিধা না পাওয়া। এসব সেবা পাওয়ার জন্য নিয়মবহির্ভূত অর্থের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে অতি সম্প্রতি ডিএমসিএইচ-২ উদ্বোধনের ফলে এসব অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.৫.৬ *সেবা পেতে অনিয়ম ও হয়রানি*

দালালের উপস্থিতি : রোগীদের অনেকেই টাকার বিনিময়ে যেমন দালালের সহায়তা পান, তেমনি দালাল দ্বারা হয়রানিরও শিকার হয়ে থাকেন। এদের মধ্যে কিছু অনিয়মিত শ্রমিকও রয়েছেন, যারা রোগীদের কাছ থেকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আদায় করে থাকেন।

নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান : হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয় (সারণি- ১)।

সারণি ১ : হাসপাতালের সেবায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের পরিমাণ

সেবা	নিয়মবহির্ভূত অর্থ (টাকা)
শয্যা	১০০ - ৩০০
সদ্যোজাত শিশুর খোঁজ খবর নিতে	৫০ - ৩০০
নবজাতক রিলিজ নেওয়ার সময়	১০০ - ১০০০
ট্রলি ব্যবহারে	৫০ - ২০০
রোগীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে	৫০ - ১০০
দ্রুত রক্ত-পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে	৫০ - ৩০০
দ্রুত এক্স-রের রিপোর্ট পেতে	১০০ - ৩০০
সিরিয়াল ভেঙে এমআরআই করাতে	৫০০ - ১০০০
ক্যাথেটার পরাতে	৫০ - ১০০
অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিতে	৫০ - ১০০
গেট পাসের জন্য	২০

[১৯] এর মধ্যে রয়েছে ক্যাপসুল ফ্লুকোজ ৫০০ এমজি, ক্যাপসুল সিপরিড ৫০০এমজি, ক্যাপসুল আমোক্সিসিলিন ২৫০ এমজি, টেপ, ক্যানোলা, স্যালাইন (শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ) ইত্যাদি।

২.৫.৭ চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে অপ্রীতিকর ঘটনায় চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। যেমন- হাসপাতালের জরুরি ও বহির্বিভাগসংলগ্ন ফুটপাতের রাস্তায় অবৈধ স্থাপনা ও বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং, চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের একাংশের অংশগ্রহণে অপ্রীতিকর ঘটনা, হাসপাতালের রোগী ও কর্মীদের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রভৃতি। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

৩. হাসপাতাল প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রদত্ত সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

৩.১ অবকাঠামোগত কারণ

যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থায় (ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন-টেমো) মেকানিকের অপ্রতুলতা। যন্ত্রপাতি ক্রয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরকিল্পনার অভাব। আবশ্যিকতা যাচাইয়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয় না, সেগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট যন্ত্রের চাহিদা, যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা ও দক্ষ জনবল। চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত আবাসন-সুবিধা নেই।

৩.২ জনবলের স্বল্পতা

জনবলের চাহিদা নির্ধারণ না হওয়া : নতুনভাবে জনবল নিয়োগের বিষয়ের দিকে নজর না দিয়ে নতুন বিভাগ খোলা ও শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৫০০ শয্যা থেকে ১৭০০ এবং সম্প্রতি ২৩০০ শয্যায় উন্নীত হলেও এর জনবল কাঠামো ৮০০ শয্যা অনুপাতে অব্যাহত।

জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা : জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জনবলের চাহিদা নির্ধারণ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠায়। পরবর্তী সময়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এটি অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৩ হাজার ৩৩৩ জনবলের চাহিদা নির্ধারণ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবর পাঠালে দীর্ঘদিন পর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে রাজস্ব খাতে ২১৪টি পদ এবং বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে অস্থায়ী ৭১০টিসহ সর্বমোট ৯২৪টি পদ সৃজনের শর্তে[২০] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হয়।[২১]

রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া : ২০০৬ সালে চিকিৎসাসেবা নেওয়া রোগীর গড় সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬৮২, যা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ৭ হাজার ২৮০ জনে।[২২]

---

[২০] পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে; প্রশাসনিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে; ওয়ার্ডবয়, আয়া, মালীসহ চতুর্থ শ্রেণির পদগুলো আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে ইত্যাদি।

[২১] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৫.১৪৫.০১৫.০০.০০.০১১.২০১০-৩১০, তারিখ : ১৪/০৬/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ।

[২২] ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য (২৪ আগস্ট ২০১৩)।

প্রশিক্ষণের অনুমতির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা : কোনো চিকিৎসক কোনো একটি বিষয়ে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ে ছুটি পান না। যখন ছুটির অনুমতি পাওয়া যায়, তখন ওই নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণটির সময় শেষ হয়ে যায় এবং চিকিৎসক ওই প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা : প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় যার ওই বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি ওই ব্যক্তির কোনো কাজে আসে না।

৩.৩ হাসপাতালপ্রদত্ত সেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ

কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পোশাক না থাকা : কর্মচারীর পরিচয় বহনকারী কোনো নির্দিষ্ট পোশাক বা আইডি কার্ড কর্মচারীদের নেই। ফলে কর্মচারী শনাক্ত করতে সমস্যা হয়।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অপর্যাপ্ত পরিদর্শন : হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাঝেমধ্যে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা না থাকা : হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের প্রভাব রয়েছে, যার কারণ বদলির ব্যবস্থা না থাকা। সরকারি অন্য কর্মকর্তাদের তিন বছর পর পর বদলির বিধান থাকলেও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বিধান নেই।

সেবা-সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহে ঘাটতি : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তথ্য সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও হাসপাতালে এ ধরনের কোনো স্থায়ী অভ্যর্থনা বা তথ্য কেন্দ্র নেই, যদিও সম্প্রতি এই গবেষণা চলাকালীন হাসপাতালের জরুরি ও বহির্বিভাগে এ সুবিধাটি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া সেবা-সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ নেই। যেমন–বার্ন ইউনিটের সামনে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কে একটি তথ্য বোর্ড থাকলেও অ্যাম্বুলেন্সের জন্য কোথায়, কার সাথে ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

ওষুধের স্টক সম্পর্কে চিকিৎসককে নিয়মিত অবহিত না করা : বহির্বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের হাসপাতালের ওষুধের স্টক সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট জানানো হয় না। এতে শেষ হয়ে যাওয়া ওষুধ পুনরায় কেনা হলেও চিকিৎসকদের জানা থাকে না বিধায় তারা রোগীকে বাইরে থেকে ওষুধ কেনার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

পথ্য ও ওষুধ সরবরাহে পর্যাপ্ত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না থাকা : যে পরিমাণে পথ্য সরবরাহ করার কথা তা যথাযথ কি না, তার পর্যাপ্ত মনিটরিং হয় না। একইভাবে ওষুধ সঠিকভাবে বণ্টন হচ্ছে কি না, তা-ও পর্যাপ্ত মনিটরিং হয় না।

নাগরিক সনদের সীমাবদ্ধতা : হাসপাতাল রোগীদের ভালো সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে নাগরিক সনদ ২০০৯-এর জুলাই মাসে প্রণয়ন করে এবং হাসপাতালের আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙানো হয়। সনদে যেসব বিষয়ে ব্যাখ্যা অনুপস্থিত তার মধ্যে রয়েছে :

- সংস্থার ভিশন ও মিশন;
- সেবাগ্রহীতারা কী ধরনের সেবা পাওয়ার অধিকার রাখেন ও সেবা পাওয়ার জন্য করণীয় কী;
- অধিকার রক্ষিত না হলে অভিযোগ দাখিলের স্থান ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা;
- হাসপাতালের প্রাপ্ত সেবা ও মূল্যতালিকা;
- উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা;
- কিছু কিছু সেবা প্রদানের সময়, সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীর আচরণ, শয্যা সেবা, ওষুধ ও পথ্য সেবা প্রভৃতি;
- তথ্য প্রদানকারীর পরিচয়, অবস্থান ও যোগাযোগের উপায় সুনির্দিষ্ট না থাকা;
- সনদ প্রণয়ন ও হালনাগাদের তারিখ।

চিত্র ১ : একনজরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

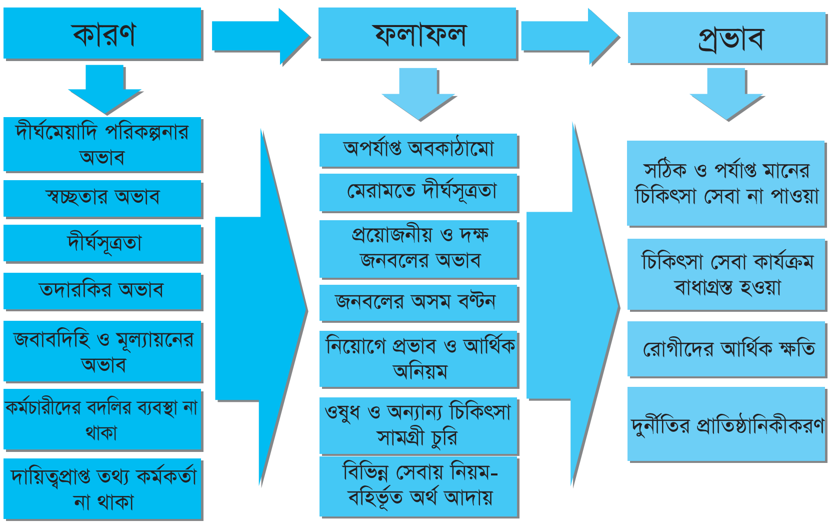

৩.৪ জবাবদিহি ও মূল্যায়নব্যবস্থা

- চিকিৎসকদের প্রতিবছরের পেশাগত কাজের অগ্রগতি (ACR অনুযায়ী) মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে এর মাধ্যমে কোনো চিকিৎসকের

পেশাগত কর্মকান্ড মূল্যায়নে মানসম্মত ও উন্নত হলেও যেমন তার পদোন্নতি হয় না, তেমনি খারাপ হলেও এর প্রভাব তাদের ওপর পড়ে না।

- চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত না হওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে হাসপাতাল ত্যাগ করলে তার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার টেলিফোনে, লিখিতভাবে ও সশরীরে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানানোর পর মাত্র স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

- চিকিৎসকরা কর্মচারীদের সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে পান না। এর জন্য কর্মচারীদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না।

- প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কোনো কোনো বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার নেই। হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশের মান উন্নয়নে, যেমন- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইউনিয়নের প্রভাবে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে না পারা, কর্মচারী ও অন্যদের যেকোনো দাবি আদায়ে চিকিৎসাসেবায় কর্মবিরতি নিষ্পত্তি, হাসপাতালসংলগ্ন অবৈধ দোকান ও যানবাহন উচ্ছেদে, আউটসোর্সিং ব্যক্তির টাকা মাসিক হিসেবে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।

৪. উপসংহার ও সুপারিশ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবার মান আরও উন্নত করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নৈতিক অবস্থানে থেকে নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকা। হাসপাতালের চিকিৎসাসেবায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির কারণে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা নিতে আসা সাধারণ জনগণ ভুক্তভোগী হয়।

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে হাসপাতালে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

৪.১ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্য

১. রোগী অনুপাতে ওয়ার্ডভিত্তিক চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারী বন্টন করতে হবে।

২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে, যেখানে হাসপাতাল-সম্পর্কিত (প্রশাসন ও চিকিৎসাসেবা) সব ধরনের হালনাগাদ তথ্য থাকবে।

৩. হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ-সম্পর্কিত প্রচারণা চালাতে হবে। যেমন– বিভিন্ন সেবার মূল্য, সেবার জন্য কোথায় যেতে হবে, কোন কোন সেবা বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে, ভিজিটরদের করণীয় ইত্যাদি। এতে রোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও সতর্ক হবে। রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি মৌখিক অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অভিযোগকারীর সুরক্ষাসহ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি 'অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি' গঠন করতে হবে।

৫. 'হাসপাতালটি সার্বক্ষণিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে'–এটি হাসপাতালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টানিয়ে দিতে হবে।

৬. চিকিৎসক, নার্স, ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি অধিকতর জোরদার করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পোশাক পরিধানে নজরদারি বৃদ্ধি করা, নির্দিষ্ট সময়ে কাজের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং কর্মচারী দ্বারা চিকিৎসকদের কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

৭. চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রণোদনা দিতে হবে।

৮. হাসপাতালের বহির্বিভাগে পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বিভিন্ন সেবা পেতে (ট্রলি, শয্যা পাওয়া, প্যাথলজি পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া) নিয়মবহির্ভূত অর্থ বন্ধ করার জন্য তদারকি বাড়াতে হবে।

১০. হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য হাসপাতালপ্রধান ও নাগরিক সমাজ, চিকিৎসক, শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যারা হাসপাতালের বিদ্যমান চিকিৎসাসেবা পর্যালোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

১১. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' অনুসারে হাসপাতালের তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে বা বিদ্যমান কাউকে এ দায়িত্ব দিতে হবে।

১২. জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসকদের হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪.২ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের জন্য

১৩. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন যাচাই সাপেক্ষে হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের চাহিদা নির্ধারণে একটি কার্যকর, সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪. হাসপাতালে শয্যা, আইসিইউ, এক্স-রে ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

১৫. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসকদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যে বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তার প্রকৃত চাহিদা যাচাই করে ওই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির প্রশিক্ষণে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দেশের বাইরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ছুটির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করতে হবে।

১৬. হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নির্ধারিত সময় পর পর বদলির বিধান করতে হবে।

১৭. অচল অ্যাম্বুলেন্স মেরামতে মেকানিকের স্বল্পতা দূর করার পাশাপাশি যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সত্ত্বেও চালু করা হয়নি তা চালু করার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

১৮. হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশের মান উন্নয়নে সেবাগ্রহীতা থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ (ন্যূনতম ২৫ শতাংশ) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ব্যয় করার ক্ষমতা দিতে হবে। একটি কমিটি করে সেটি কীভাবে খরচ করা হবে তার দিকনির্দেশনাসহ এরূপ তহবিল ব্যবহারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে।

১৯. মিডিয়া, এসএমএস, বিল বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে এবং জনগণের অধিকার ও প্রাপ্য সেবা ও ভিজিটরদের করণীয় প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০. এনেসথেটিস্ট- এই পেশায় বিশেষজ্ঞদের জন্য কার্যকর প্রণোদনাসহ পর্যাপ্ত পদ সৃষ্টি করতে হবে।

২১. বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক ও নার্সদের হাসপাতাল-সংলগ্ন আবাসন-সুবিধা বাড়াতে হবে।

২২. হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নে কর্মচারী ইউনিয়নের প্রভাব কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৩. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্বিক চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একসাথে আলোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে আগামী ৩০ বছরের জনবলের চাহিদা, নিয়োগ, পদোন্নতি, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, আবাসন সুবিধা, বরাদ্দ প্রভৃতি।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় জেলা পরিষদ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

নাহিদ শারমীন

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জনগণের ক্ষমতায়ন, সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগে গতি সঞ্চারের ক্ষেত্রে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'জেলা পরিষদ' বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের প্রথম স্তরের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত সবগুলো কমিশনই তাদের প্রতিবেদনে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছে।

২০১১ সালে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়, যা নিয়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। নির্বাচন না দিয়ে জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং পরিষদের কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন) নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা সম্পন্ন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা পরিষদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার ধারাবাহিকতায় এই কার্যপত্র প্রণীত হয়েছে।

১.২ কার্যপত্রের উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই কার্যপত্রের উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের অবস্থান আলোচনা করা, এ প্রতিষ্ঠান প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে করণীয় নিয়ে আলোচনা করা। এ গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাকাঠামোয় জেলা পরিষদের অবস্থান, গঠনপ্রক্রিয়া, জেলা পরিষদের কার্যক্রম ও সক্ষমতা, জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগপ্রক্রিয়া ও এখতিয়ার, সংসদ সদস্যের ভূমিকা, অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় এবং জেলা পরিষদ প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

* ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের সময়

কার্যপত্রটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ঠিকাদার, স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া পরোক্ষ তথ্যের জন্য স্থানীয় সরকারবিষয়ক বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, নির্দেশনা, বিভিন্ন গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, বই, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়। ২০১৩-এর জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৪-এর মার্চ পর্যন্ত এ কার্যপত্রের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ জেলা পরিষদের বিবর্তন : জেলা পরিষদের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, স্থানীয় শাসনের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি, যদিও নীতিগত ও আইনগতভাবে এ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব সরকারের সময়েই জেলা পরিষদের কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষ করে জেলা প্রশাসক অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্য অথবা সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.২ জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগের প্রক্রিয়া : ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার ৬১টি জেলা পরিষদে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রশাসক নিয়োগের আদেশ জারির মাধ্যমে জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ দেয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় অবস্থিত সরকারি কর্মকর্তাদের (জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব প্রভৃতি) ক্ষমতাসীন দলের যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিকদের তালিকা তৈরি করে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় শাখা বা কমিটি থেকে আরেকটি তালিকা পাঠানো হয়। এ দুটি তালিকার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জেলা পরিষদ প্রশাসক মনোনীত করা হয় ও নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়াই দলীয় বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে, যা সংবিধান[২৩] ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের[২৪] পরিপন্থী।

২.৩ জেলা পর্যায়ের ক্ষমতাকাঠামোতে জেলা পরিষদের দুর্বল অবস্থান : বর্তমান জেলা পর্যায়ের ক্ষমতাকাঠামোতে জেলা প্রশাসক, সংসদ সদস্য এবং জেলা পরিষদ প্রশাসকের মধ্যে সংসদ সদস্য সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে জেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে করা হয়। মূলত জেলা পর্যায়ের সব কাজ প্রশাসককে

---

[২৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯ (১)-এ উল্লেখ করা হয়, প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রদান করা হবে ।

[২৪] কুদরত-ইলাহি পনির বনাম বাংলাদেশ, ৪৪ ডিএলআর (এডি)(১৯৯২) মামলার রায়ে বলা হয়, 'নির্বাচনের মাধ্যমে অনির্বাচিত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ যথাশীঘ্রই নিতে হবে। তবে এ সময় এখন থেকে যেন ছয় মাসের বেশি না হয়।' (সূত্র : মজুমদার, ২০১১)

অবহিত করে সম্পাদন করা হয়। জেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেলা পরিষদ প্রশাসক কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন না। জেলার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করার কথা আইনে উল্লেখ থাকলেও কীভাবে এ কাজ সম্পন্ন করবেন সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

২.৪ জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেলা পরিষদের ভূমিকা না থাকা : জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জেলা প্রশাসকের অধীনে করা হয়। এ ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের কোনো ধরনের ভূমিকা নেই। তবে কবরস্থান ভরাট, সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, মসজিদ সংস্কার, মন্দির উন্নয়ন, ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন, সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জেলা পরিষদ সম্পন্ন করে। জেলা পরিষদের পাঁচসালাসহ বিভিন্ন মেয়াদি কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা নেই।

২.৫ সরকারের নিয়ন্ত্রণ : সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা পরিষদ বাণিজ্যিক কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে। জেলায় অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কাজ সরকারের অধীনে থাকবে না জেলা পরিষদের অধীনে থাকবে তা নির্ধারণ করে সরকার। জেলা পরিষদ কী ধরনের কাজ সম্পাদন, বাতিল, স্থগিত করবে তা সরকারের নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল।

২.৬ জেলা পরিষদে সংসদ সদস্যের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা : প্রকল্প প্রণয়নে সংসদ সদস্যরা নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য দেওয়াসহ অনেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদকে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রাধান্য দিতে হয়। জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংসদ সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

২.৭ স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া : জেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করার জন্য সাতটি স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও কোনো স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি।

২.৮ জনবলের স্বল্পতা : কোনো কোনো জেলা পরিষদে ১০ থেকে ১১টি পদ শূন্য রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সব ধরনের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলেও পদগুলো পূরণ করা হয়নি।

২.৯ সব আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পাদন না হওয়া : জেলার সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে না। তবে জেলা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যাবলি, যেমন- মার্কেট ব্যবস্থাপনা, খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি সেন্টার ব্যবস্থাপনা, ডাকবাংলো ব্যবস্থাপনা, যুব ও বেকার সমস্যা নিরসনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে থাকে।

২.১০ রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের দ্বারা জেলা পরিষদের সম্পত্তি বেদখল : স্থানীয় পর্যায়ের কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেলা পরিষদের সম্পত্তি (জমি, গাছ, খেয়াঘাট, মার্কেট প্রভৃতি) তাদের দখলে নিয়েছেন বলে গবেষণায় দেখা যায়।

২.১১ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে জেলা পরিষদের সমন্বয়ের অভাব : গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সমন্বয় সভা হয় না এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়কারী হিসেবে কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করে না। জেলা পরিষদ অন্যান্য স্থানীয়

সরকার প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ বিবেচনা করে কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের মতে, পরিষদের সাথে আলোচনা ও সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই সিটি করপোরেশন পরিষদের গাছ, স্থাবর সম্পত্তি, রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, হাটবাজার, ফেরিঘাট দখল করে নেয়। কিন্তু জেলা পরিষদ এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

২.১২ জেলা পরিষদ প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব : সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা ছাড়া পরিষদ প্রশাসক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আবার অন্যদিকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশাসকের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও নিতে পারেন না।

২.১৩ জেলা পরিষদ প্রশাসকের জবাবদিহি কাঠামোর অভাব : পরিষদের সব ধরনের সিদ্ধান্ত প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু প্রশাসক তার কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করবেন, সে সম্পর্কে কোনো পরিপত্র বা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি এবং আইনেও উল্লেখ করা হয়নি।

২.১৪ কর্মচারীদের প্রণোদনা ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার অভাব : জেলা পরিষদ তার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব কর্মচারীর কাজের ওপর ভিত্তি করে কোনো ধরনের প্রণোদনা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার পরিষদের নেই।

২.১৫ যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রকল্প অনুমোদন : জেলা পরিষদে প্রতিবছর ১৫০ থেকে ২০০টি প্রকল্প চলমান থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এসব প্রকল্প বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ছাড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

২.১৬ জেলা পরিষদ প্রশাসকের এখতিয়ারের ক্ষেত্র অস্পষ্ট : জেলা পরিষদের প্রশাসক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং কোন বিষয়ে পারবেন না, সেসব বিষয়ে কোনো কিছুই স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জানানো হয়নি। প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসকের এখতিয়ার কতটুকু, সে বিষয়ে প্রশাসক অবহিত নন। কর্মীদের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রশাসকের ভূমিকা কতটুকু হবে, সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

২.১৭ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার : ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মধ্য থেকে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার ফলে জেলা পরিষদ কার্যালয় রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দলীয় কর্মীদের চা-নাস্তা খাওয়ানোর জন্য ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পরিষদের অর্থ থেকে ব্যয় করা হয়। এ ছাড়া দলীয় কর্মীরা জেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন।

২.১৮ জেলা পরিষদের আর্থিক সক্ষমতার অভাব : জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ নিজস্ব আয় থেকে বেশি হয়। জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় করা হয় সংস্থাপন খাতে। ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সরকারি অনুদানের পরিমাণ মোট বাজেটের ৩২ থেকে ৬০ শতাংশ।

৩. জেলা পরিষদে উপরিউক্ত অবস্থা বিরাজ করার কারণ

৩.১ রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব : জেলা পরিষদ প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন না করার পেছনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। ২০০৮ সালের নবম সংসদ ও ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে বলে উল্লেখ করা হলেও আইন প্রণয়ণের পর দীর্ঘ ১৩ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৩.২ আইনগত সীমাবদ্ধতা : জেলা পরিষদের সম্পাদিতব্য সব নির্মাণকাজের পরিকল্পনা, নির্মাণকাজ কার দ্বারা সম্পন্ন করা হবে- এ সবকিছুই সরকার নির্ধারণ করবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়। পরিষদের কার্যকলাপের নির্দেশ দান, সামঞ্জস্য বিধান, বাতিল, স্থগিতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদের ওপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং জেলা পরিষদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সরকারের পূর্ব অনুমোদনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হয়।

সরকার যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জেলা পরিষদের (আইনের অধীন) সব ক্ষমতা বা যেকোনো ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে এবং জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবেন বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নির্বাচন ছাড়াই তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যরা জেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বিভিন্ন কাজের সহায়তার জন্য পরিষদ বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে, যেখানে পরিষদের সদস্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করার ফলে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের ঝুঁকি তৈরি হয়।

৩.৩ প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারার অন্যতম কারণ প্রশাসনিক উদ্যোগের ঘাটতি। পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রশাসন থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জেলা পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রশাসন থেকে কৌশল নির্ধারণ করা হয়নি। জেলা পরিষদ প্রশাসকের কাজের পরিধি কতটুকু হবে, পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের কাজের জন্য প্রশাসকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন কি না এবং প্রশাসক কার কাছে জবাবদিহি করবেনা সে বিষয়ে প্রশাসন বা স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

৪. জেলা পরিষদের কার্যকরতায় প্রভাব

৪.১ অকার্যকর জেলা পরিষদ : নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া, সাতটি স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দলীয় প্রশাসকের মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি কারণে

জেলা পরিষদ সরকারের ওপর নির্ভরশীল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দলীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়ার ফলে জেলা পরিষদ ক্ষমতাসীন দলের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত প্রশাসকের যাবতীয় খরচ ও রাজনৈতিক কর্মীদের চা-নাস্তা জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় থেকে বহন করার ফলে সাধারণ জনগণ এ থেকে উপকৃত হয় না।

চিত্র ১ : জেলা পরিষদ প্রত্যাশিতভাবে কার্যকর না হওয়ার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

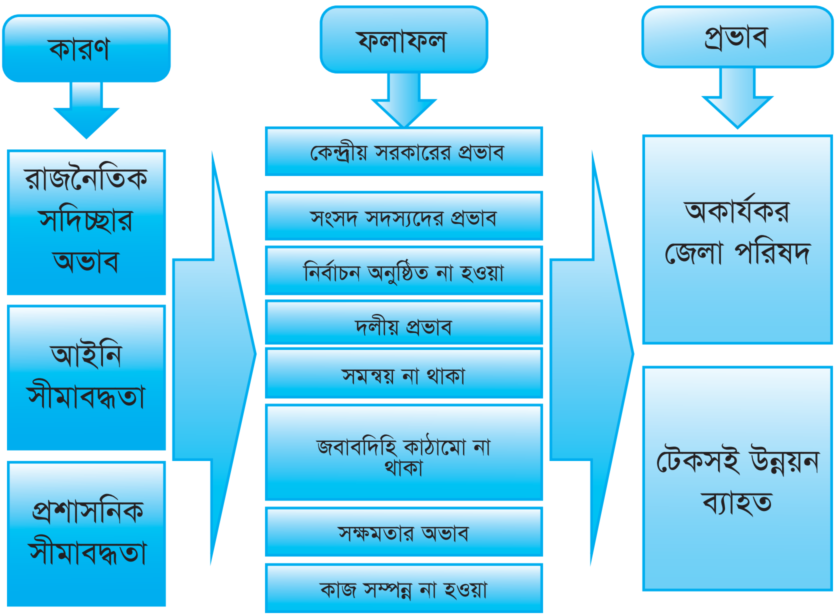

৪.২ টেকসই উন্নয়ন না হওয়া : জেলার উন্নয়নে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। সরকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা করে যার ফলে স্থানীয় উন্নয়ন টেকসই হয় না।

৫. উপসংহার

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, যা একটি নির্বাচিত ও কার্যকর জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সম্ভব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্থানীয় শাসনের লক্ষ্যে এই পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব সরকারের সময়েই জেলা পরিষদের কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষ করে জেলা প্রশাসক অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের অথবা সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো সরকারই জেলা পরিষদের নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়নি।

জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দুটি শক্তিশালী স্বার্থের বিরোধিতার সম্মুখীন। প্রথমত, জাতীয় সংসদের সদস্যরা চান না স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্তি, কর্তৃত্ব ও কৃতিত্ব লোপ পাক, যেহেতু এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের পুনর্নির্বাচন এবং প্রতিপত্তি নিশ্চিত করা হয়। তাই তারা জেলা পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ক্ষমতা-বলয়ে জনগণের অংশীদারত্বকে মেনে নিতে পারেন না। কারণ এর ফলে তাদের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। সরকারি কর্মকর্তারা তাদের কাজের জন্য জেলা সরকার নয়; বরং সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চান। এসব কারণে আইন প্রণয়ণের পর দীর্ঘ ১৩ বছর অতিবাহিত হলেও জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার থেকে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জেলা পরিষদ একটি অবহেলিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

৬. সুপারিশ

১. সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠন করতে হবে।

২. জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জেলা প্রশাসকের কাজের পরিধি নির্বাহী দায়িত্বে সীমাবদ্ধ রেখে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসকের কাজের সুষম বণ্টন করতে হবে।

৩. জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত–

- জেলা পরিষদ প্রশাসক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় করতে হবে।
- জেলা পরিষদ প্রশাসকের দায়িত্বের মেয়াদ ছয় মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪. জেলা পরিষদ আইন-২০০০-এর সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য নিচের সংশোধনগুলো করতে হবে–

- প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তে পরিষদের স্থায়ী কমিটির অনুমোদন এবং চেয়ারম্যানের অনুমতির ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (ধারা ২৮)।
- কোনো প্রতিষ্ঠান ও কর্ম কার ব্যবস্থাপনায় থাকবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও পরিষদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (ধারা ২৯)।
- জেলা পরিষদের কাজে সংসদ সদস্যদের নির্দেশনা ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে (ধারা ৩০)।
- পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে 'অন্য কোনো ব্যক্তি' সমন্বয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (ধারা ৩৪)।

- পরিষদের ওপর সরকারের এখতিয়ার কতটুকু তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (ধারা ৫৭)।
- পরিষদের কার্যাবলির ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকারকে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে (ধারা ৫৮)।
- জেলা পরিষদ প্রশাসকের নিয়োগপ্রক্রিয়া, যোগ্যতা, ক্ষমতা এবং প্রশাসক কার কাছে জবাবদিহি করবেন তা উল্লেখ করতে হবে [ধারা ৮২(১)]।

৫. জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শূন্য পদ পূরণ করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ) সাথে মাসিক সভা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৭. যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

৯. জেলা পরিষদের কর্মচারীদের কাজের ওপর ভিত্তি করে প্রণোদনা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার এখতিয়ার পরিষদকে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আকরাম, শম, ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আলি, কআ, ২০০৩, *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*, সূচিপত্র, ঢাকা।

আহমেদ, ম, 'জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ নেই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ জানুয়ারি ২০১৪।

আহমেদ, ত, ২০০২, *একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন : কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব*, ঢাকা।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০।
আহমেদ, ত, 'জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনে সংস্কার', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ ডিসেম্বর ২০১১।

ইসলাম, শ 'জেলা পরিষদ নির্বাচনে সরকারের অনীহা দায়িত্বে আছেন দলীয় নেতারা', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

ইমন, মএক, 'সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদে এর প্রশাসক নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা', সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৪, *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

মজুমদার, বআ, 'কেন এই স্বেচ্ছাচারিতামূলক সিদ্ধান্ত?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১১।

মুহিত, আমআ, ২০০২, জেলায় জেলায় সরকার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, মম, ১৯৯৯, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

Ali, S, 1982, *Field Administration and Rural Development in Bangladesh,* CSS, Dhaka.

Sidiqui, K, 1992, *Local Government in South Asia,* UPL, Dhaka.

Arora, R K & Goyal, R, 1996, *Indian Public Administration,* Wishwa Prakashan, New Delhi.

Cheema, GS, and Rondinelli, DA, 1983, *Decentralisation and Development: Policy Implementation in Developing Countries,* Sage Publications.

Rahman. M, Govt insincerity holds back district councils, *Daily New Age,* 9 February 2014.

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*

নাহিদ শারমীন ও শাহজাদা এম আকরাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এলজিইডি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিভূত একটি প্রতিষ্ঠান, যা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন (এলজিআরডি) ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন। এর মোট জনশক্তির প্রায় ৯৯ শতাংশ জেলা ও উপজেলা স্তরে কর্মরত। প্রায় প্রতিবছর অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ বাড়ছে, যার প্রধান একটি অংশ ব্যয় হচ্ছে এলজিইডির মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন অর্জন সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা, সরকারি ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এলজিইডির কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে এলজিইডিতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব লক্ষ করা যায়। এই সীমাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে স্থানীয় সরকার খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত ও এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. এলজিইডির আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;

২. এলজিইডির কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা ও কারণ নিরূপণ করা এবং

৩. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণায় এলজিইডির আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, আর্থিক বরাদ্দ, জনবল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস নিয়ে আলোচনা

---

* ২০১৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকায় গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

করা হয়েছে। এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং এ প্রক্রিয়ায় (যেমন- দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদারকি) স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির ভূমিকা এবং এলজিইডির কার্যক্রমের নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ এলজিইডির সব প্রকল্প ও সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এলজিইডিতে বিদ্যমান দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের সময়

এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহকৌশল যেমন- সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের [এলজিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) ও হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়] কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, সাধারণ জনগণ ও সাংবাদিক। এ ছাড়া স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে সাতটি দলীয় আলোচনা এবং সম্প্রতি বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের নয়টি উপজেলায় অবস্থিত ১০৮টি স্কিম ও একটি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, এলজিইডি থেকে সংগৃহীত তথ্য, এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিজিএ ও সিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন, এলজিইডির প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

২০১০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৩-এর মে পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন এ বছর ১৮ এপ্রিল এলজিইডির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিবেদনের ওপর মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ৬ থেকে ৮ মে এলজিইডির ঢাকা কার্যালয়ে গবেষণা দলকে এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। এসব মতামত আবার যাচাই করার জন্য মাঠপর্যায় থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও প্রতিবেদন হালনাগাদ করা হয় এবং ২ জুলাই হালনাগাদকৃত প্রতিবেদনের ওপর আরেকটি উপস্থাপনা করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ এলজিইডির আইনি কাঠামো ও এর সীমাবদ্ধতা

এলজিইডি যেসব আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তার মধ্যে 'পল্লী উন্নয়ন কৌশল', 'নগর ব্যবস্থাপনা নীতিমালা', 'জাতীয় পানি নীতিমালা', 'জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল-২ (সংশোধিত) ২০০৯-১১', 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯', 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮' এবং 'সরকারি গাড়ি

ব্যবহার বিধি' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এলজিইডির জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি ও নীতিমালা, যেমন– আউটসোর্সিং নীতিমালা, উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ-সংক্রান্ত নীতিমালা, পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি-সংক্রান্ত; যেমন- উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগে এলজিইডির জন্য পৃথক কোনো বিধিমালা না থাকা এবং নির্ধারিত পরীক্ষা, মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দেওয়ার উল্লেখ থাকলেও কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার মূল্যায়ন এবং কাজ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার বিষয়টি নিয়োগ বিধিমালায় উল্লেখ না থাকা। এ ছাড়া লজিস্টিকস ব্যবহার-সংক্রান্ত কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন- অধিদপ্তর অথবা মন্ত্রণালয়ের লজিস্টিকস ব্যবহার-সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা না থাকা, প্রকল্পের গাড়ি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে বিধিতে উল্লেখ না থাকা; প্রকল্প পরিসমাপ্তির পর গাড়িগুলো কীভাবে ব্যবহার হবে; প্রকল্প পরিচালক থেকে শুরু করে প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা কীভাবে এবং কোন পর্যায় পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন, সে সম্পর্কে কোনো দিকনির্দেশনা না থাকা উল্লেখযোগ্য।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও সীমাবদ্ধতা

২.২.১ *প্রধান প্রকৌশলীর একচ্ছত্র ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ*

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত থেকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। এলজিইডির এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক প্রধান প্রকৌশলী যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি), প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন ও ক্রয়-প্রক্রিয়া। এ ছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর ব্যক্তিগত কাজেও এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহার করার উদাহরণ রয়েছে।

২.২.২ *জনবল ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সমস্যা ও অনিয়ম*

নিয়োগ : রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে এলজিইডিতে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ দুই ধরনের নিয়োগেই সমস্যা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। এলজিইডিতে প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে সরকারি কর্মকমিশন, যা সময়সাপেক্ষ। হাইকোর্টে নিয়োগ-সংক্রান্ত কেস চলাকালীন নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে দীর্ঘদিন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। উন্নয়ন বাজেটের অধীনে প্রকল্পের কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য এলজিইডিতে কোনো নিয়োগ নীতিমালা নেই। এলজিইডিতে প্রকল্পগুলোর অধীনে কতজন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা থাকে না। এক প্রকল্প শেষ হলে অন্য প্রকল্পে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় এবং এ ক্ষেত্রে এসব কর্মীকে কোনো নিয়োগ পরীক্ষা দিতে হতো না। আগে প্রকল্পভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হতো না, তবে সম্প্রতি নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে।

পদায়ন : সুবিধাজনক জেলা বা উপজেলায় পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ ও প্রধান প্রকৌশলীর ক্ষমতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয় সম্পূর্ণ প্রধান প্রকৌশলীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ২০১২ সালের আগস্টে ১ হাজার ৮৩৭ জনকে বিধি লঙ্ঘন করে রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয়।

বদলি : বদলির ক্ষেত্রে তদবির, ঘুষ বা রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কর্মকর্তা যদি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে না পারেন, তাহলে তাকে আবার বদলি করা হয়। তা ছাড়া সদর দপ্তর থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে যাওয়ার জন্য সবাই চেষ্টা করেন। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ বেশি হয়। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবৈধ আয়ের সুযোগ বেড়ে যায়।

পদোন্নতি : এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। এই তালিকা ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পাঁচবার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে দেখা যায়। মামলার ওপরে পদোন্নতি নির্ভর করলেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পদের স্বল্পতা রয়েছে যার ফলে সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের 'নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত' বলে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রধান প্রকৌশলী অফিস আদেশের মাধ্যমে এ ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, যদিও সহকারী প্রকৌশলীদের নির্বাহী প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া প্রধান প্রকৌশলীর এখতিয়ারের বাইরে।

২.২.৩ *পরামর্শক নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অনিয়ম*

এলজিইডিতে পরামর্শক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। কোনো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আইডিএর আর্থিক সহায়তায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন' প্রকল্পে এলজিইডির কয়েকজন কর্মকর্তাকে পরামর্শক হিসেবে উল্লেখ করে ছয় থেকে সাত গুণ বেশি বেতন দেওয়া হয়, যেখানে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়েই নিয়োগ দেওয়া হয়।

২.২.৪ *অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লজিস্টিকস ব্যবহার*

এক প্রকল্পের লজিস্টিকস অন্য প্রকল্পে ব্যবহার করার জন্য কোনো নীতিমালা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের নেই। প্রকল্পের লজিস্টিকস, যেমন- আসবাব, কম্পিউটার প্রভৃতি প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ করা যায়।

সরকারি নীতিমালা না মেনে গাড়ি ব্যবহার : বর্তমানে এলজিইডিতে রাজস্ব খাতভুক্ত ১৫৬টি ও প্রকল্প খাতভুক্ত ২০৯টি গাড়ি চলমান। কিন্তু কতগুলো গাড়ি বিদেশি মিশন বা পরামর্শক দলের ব্যবহার ও জেলা পর্যায়ের সফর করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য এলজিইডিতে নেই। সরকারি গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা না মেনে সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে ঢাকার বাইরে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িচালকরা এ জন্য ওভারটাইম দাবি করেন এবং সে অনুযায়ী ওভারটাইম পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গাড়ির প্রয়োজন হলে এলজিইডির ওপর নির্ভর করেন।

গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে দুর্নীতি : পরিবহন শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি কেনার নামে অর্থ আত্মসাৎ করেন। গাড়িতে কাজ করার প্রয়োজন না থাকলেও গাড়ির চালককে না জানিয়ে গাড়ির নামে বিল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়। নিজস্ব গ্যারেজ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি

ওয়ার্কশপে এলজিইডির গাড়ির কাজ করানো হয়, যেখান থেকেও অতিরিক্ত বিল করে নেওয়া হয় এবং সেই বিল জমা দেওয়া হয়।

২.২.৫ *আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সীমাবদ্ধতা*

এলজিইডির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সিএজি কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয় তার মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম টাকা কর্তন, বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা দেওয়া উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, পূর্তকাজ ও জিওবি (প্রকল্প) অডিট আপত্তি অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন অর্থের পরিমাণ ১ হাজার ৩৬৯ দশমিক ৪০ কোটি টাকা।

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরনের কথা প্রচলিত আছে : 'অডিট করাবেন, না অডিট করব?'। অর্থাৎ নিরীক্ষা করার সময়ে নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা (ঘুষ, আপ্যায়ন প্রভৃতি) পূরণ করা হলে তাকে 'অডিট করাবেন' বলে ধরা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইচ্ছানুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ থাকে। অন্যদিকে যখন নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা পূরণ করা হয় না, তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী নিরীক্ষা করে থাকেন, তখন তাকে 'অডিট করব' বলে ধরা হয়। টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে অডিট করানো হয় না। জনবলের স্বল্পতার কারণে পূর্ত নিরীক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্তৃক সব প্রকল্পের নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

২.২.৬ *তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ*

এলজিইডির 'নাগরিক সনদ' ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকলেও প্রধান কার্যালয় এবং স্থানীয় কোনো কার্যালয়ে এটি জনসমক্ষে টাঙানো নেই। ফলে এটি সাধারণ জনগণ ও এলজিইডির সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (ঠিকাদার, পরামর্শক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি) ব্যবহারের উপযোগী নয়। নাগরিক সনদে বিস্তারিত তথ্যের অভাব লক্ষ করা যায়। ওয়েবসাইটে জনবল-সংক্রান্ত সব তথ্য দেওয়া নেই (উন্নয়ন বাজেটের অধীনে জনবল, শূন্যপদের তথ্য), এলজিইডি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের সবগুলো দেওয়া নেই (যেমন- প্রকল্প প্রস্তাবনা, আইএমইডির প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন) এবং ই-গভর্ন্যান্স চালু করা হয়েছে বলা হলেও বাস্তবে এটি মাত্র শুরু হয়েছে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখনো চালু হয়নি; শুধু কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চালু হয়েছে।

২.৩ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও সীমাবদ্ধতা

২.৩.১ *প্রকল্প গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ*

দেখা যায়, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, সেসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা করে থাকেন। ফলে বিভিন্ন সরকারের আমলে কিছু বিশেষ এলাকার উন্নয়ন বেশি হয়ে থাকে। এ ছাড়া এলাকা নির্দিষ্ট করে প্রকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরও সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকেন, যার ফলে প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে হয়।

২.৩.২ *সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন*

বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি লক্ষ করা যায়। এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া কাজের সম্ভাব্যতা সঠিকভাবে যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

২.৩.৩ *পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা*

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করার পর এলজিইডির সুপারিশ, স্থানীয় জনগণ, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য সুবিধাভোগীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্যতার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এলজিইডির কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু এলজিইডির লোকবলের অভাবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে মতামত দিতে দেরি হয়। এ ছাড়া প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নির্বাহী প্রকৌশলীর সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

২.৩.৪ *প্রকল্প পরিকল্পনায় সংশোধন ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা বিবেচনা না করা*

এলজিইডিতে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এলজিইডির প্রায় সব প্রকল্প একাধিকবার সংশোধন করতে হয়, ফলে পাঁচ বছরমেয়াদি প্রকল্পের সময় বেড়ে ১০-১১ বছর হয়ে যায়। ফলে প্রকল্পের শুরুতে যে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই তা সংস্কার করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু চলমান প্রকল্পের কোনো স্কিমের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ থাকে না।

২.৩.৫ *প্রকল্প প্রস্তাবনায় ব্যয় প্রাক্কলনে অনিয়ম*

এলজিইডির কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তাবনায় ব্যয় প্রাক্কলনে যে ধরনের অনিয়ম লক্ষ করা যায়, এর মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের চেয়ে কম অর্থ বরাদ্দ, একই কাজের ব্যয় একেক প্রকল্পে একেক হারে ধরা এবং উপাদানের প্রয়োজন না থাকলেও বরাদ্দ রাখা উল্লেখযোগ্য।

২.৩.৬ *প্রকল্পের ধারণা থেকে বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা*

একটি প্রকল্প ধারণা থেকে প্রস্তাব তৈরির পর্যায়ে যেতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন মাস প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া একটি প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজন হয় এবং এরপর বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে অনেক প্রকল্পের চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রয়োজন হয়। গবেষণায় পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্পের প্রস্তাবনা ১৯৯২ সালে একনেক সভায় গৃহীত হলেও ১৯৯৭ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

২.৩.৭ *প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব*

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে (সাহায্য বা ঋণ হিসেবে) বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওই সংস্থার সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের নির্দেশিত খাতকে বিবেচনায় নিয়েই এলজিইডি প্রকল্প প্রণয়ন করে থাকে। এমনকি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়।

২.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি

২.৪.১ কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব

স্থানীয় পর্যায়ে এলজিইডির কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া সাধারণত রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন দল ও দলের সহযোগী সংগঠনের সদস্যরা এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী বা তার আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আর এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সাধারণত দরপত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের নিকটজন ও আস্থাভাজনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যরা সাধারণত বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নেন। কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে প্রকৌশলীদের সমঝোতা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে দরপত্র জমা দেওয়ার আগেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। রাজনীতিকদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৌশলীদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৌশলীরা যখন কোনো কাজ পরিদর্শন বা তদারকি করতে যান, তখন ঠিকাদারদের (যিনি একই সাথে ঠিকাদার ও রাজনীতিক) কাছ থেকে কখনো কখনো নানা ধরনের হুমকি পান এবং অনেক সময় শারীরিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়।

২.৪.২ দরপত্র নিয়ন্ত্রণ

যেসব উপায়ে স্থানীয় পর্যায়ে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেগুলো হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগেই ঠিকাদার অবহিত হওয়া, পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, দরপত্র প্রাপ্তির সীমিত সময়, রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র শিডিউল জমা, দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে না দেওয়া, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত না হওয়া এবং স্থানীয় প্রশাসন থেকে অসহযোগিতা। উল্লেখ্য, বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে।

২.৪.৩ অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার

স্থানীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে দরপত্র কেনা থেকে শুরু করে কার্যাদেশ নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়, যা এলজিইডির জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের যেসব নেতা-কর্মীর কাজ পাওয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, তারা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লাইসেন্স ব্যবহার করে কার্যাদেশ নিয়ে থাকেন।

২.৪.৪ কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিক্রি করে দেওয়া

স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী এলজিইডি থেকে কার্যাদেশ পাওয়ার পর তা বিক্রি করে দেওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। এ ক্ষেত্রে যাকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশনের বিনিময়ে অন্যের কাছে ওই কার্যাদেশ বিক্রি করে দেন।

২.৪.৫ প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দুর্নীতি

এলজিইডির স্থানীয় কার্যালয়ের প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের মধ্যে সমঝোতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়।

কার্যাদেশ পাওয়ার পর দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন : কার্যাদেশ পাওয়ার পর দরপত্রের তথ্য পরিবর্তন করা হয় । ঠিকাদার প্রথমে ৫ শতাংশ 'লেস'-এ দরপত্র দাখিল করেন এবং কাজ পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সব কাগজপত্র পরিবর্তন করে ৫ শতাংশ অতিরিক্ত ধরে দাখিল করে থাকেন, যা প্রকৌশলী ও ঠিকাদার ভাগ করে নেন ।

ব্যাংকের কার্যসম্পাদন জামানত (Performance Security) সংক্রান্ত অনিয়ম : স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ শুরু করার দু-তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে কার্যসম্পাদন জামানত নিয়মবহির্ভূতভাবে তুলে নেওয়া হয় । এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীকে এর কিছু অংশ দিতে হয়, যেহেতু ঠিকাদার এই টাকা তুলে অন্য কোথাও বিনিয়োগ অথবা ব্যাংকে জমা রেখে সুদ নিতে পারেন ।

সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৌশলী ও ঠিকাদার নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত কাজের কিছু অংশ বাদ দিয়ে থাকেন । এ ছাড়া একটি স্কিম যেভাবে পরিকল্পনা করা হয় বাস্তবায়নের সময় সেই পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্য থাকে না । উদাহরণস্বরূপ, এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্পের প্রস্তাবনায় ১০টি ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণ ও ৭৭টি গ্রোথ সেন্টার বাস্তবায়িত এবং উন্নয়ন করা হবে বলে উল্লেখ থাকলেও পর্যবেক্ষণে ছয়টির মধ্যে দুটি ইউপি কমপ্লেক্স ও ৪৫টির মধ্যে আটটি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়নি বলে দেখা যায় । ফলে যথাক্রমে ৬০ লাখ টাকা ও ১ দশমিক ৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ।

২.৪.৬ *বিল উত্তোলনের সময় দুর্নীতি*

প্রকৌশলী কর্তৃক চাঁদাবাজি : প্রধান কার্যালয় থেকে অর্থছাড়করণের চিঠি পাঠালেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে নির্বাহী প্রকৌশলী এ বিষয়ে ঠিকাদারদের না জানিয়ে প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে বরাদ্দ আনার কথা বলে তাদের কাছে অর্থ (কমিশন) দাবি করেন ।

ঠিকাদারদের বিল থেকে কমিশন কেটে রাখা : প্রত্যেক ঠিকাদারকে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কমিশন হিসেবে প্রতিটি বিল থেকে দিতে হয়, যার পরিমাণ ঠিকাদারের বিলের ৮ দশমিক ৫ থেকে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ । এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরে সারা দেশে এলজিইডি থেকে মোট ২৫ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা বিল হিসাবে ছাড় করা হয় । ওপরে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী (৮ দশমিক ৫ থেকে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ ধরে) প্রাক্কলন করে দেখা যায় ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত এলজিইডির বিল হিসাবে ব্যয়কৃত অর্থ থেকে ২ হাজার ১৭২ দশমিক ৮৫৫ কোটি থেকে ২ হাজার ৬৮৪ দশমিক ১১৫ কোটি টাকা কমিশন হিসেবে বিল থেকে আদায় করা হয়েছে ।

জামানত ও বিলের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা : নিয়ম অনুযায়ী কাজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা পাওয়ার কথা, কিন্তু কাজ শেষ করার পর তহবিলের অভাবের কারণে টাকা তোলা যায় না ।

সারণি ১ : ঠিকাদারদের বিল থেকে আদায়কৃত অর্থ

কর্মকর্তা-কর্মচারী	ঠিকাদারদের বিল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (শতাংশ/নগদ টাকা)
নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫ শতাংশ- ১ শতাংশ
সহকারী প্রকৌশলী	১ শতাংশ
উপসহকারী প্রকৌশলী	২ শতাংশ- ৩ শতাংশ
হিসাবরক্ষক	১ শতাংশ
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ক্ষেত্রবিশেষে)	শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ
প্রকল্প পরামর্শক	১ শতাংশ
উপজেলা প্রকৌশলী	১ শতাংশ
প্রকল্প পরিচালক (ফান্ড রিলিজ)	১ শতাংশ
মোট	৮ শতাংশ- ১০ শতাংশ
সরকারি অর্থায়নের প্রকল্প হলে অতিরিক্ত কমিশন	
কোষাধ্যক্ষ	শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ
মোট	৮ দশমিক ৫ শতাংশ- ১০ দশমিক ৫ শতাংশ

সূত্র : স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে।

২.৪.৭ অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি

ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট ভালো দেওয়ার জন্য ঠিকাদাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুষ দিয়ে থাকেন, যা কাজের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া টাকার বিনিময়ে প্রতিবেদনে সঠিক উপকরণ ও মান দেখানো হয় এবং বিভিন্ন মানের উপকরণ ব্যবহার করা হলেও ল্যাব টেস্টের জন্য ভালো উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

২.৫ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা

নির্ধারিত ছক ব্যবহার করার কারণে গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া : নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ওপর ভিত্তি করে শুধু পরিমাণগত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবীক্ষণ করা হয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য ও কাজের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শকের ওপর প্রকৌশলীর প্রভাব : একটি প্রকল্পের সবগুলো স্কিম পরামর্শকরা পরিদর্শন করেন না; বরং এ ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সুপারিশ অনুযায়ী পরামর্শকরা প্রকল্পের বিভিন্ন স্কিম পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী ও পরামর্শকরা মাঠ পরিদর্শন না করে পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন দেন।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে ঘাটতি : স্থানীয় এলজিইডির অধীনে একই সাথে কমপক্ষে ২০টি প্রকল্পের অধীনে শতাধিক স্কিমের কাজ চলে বলে এলজিইডির কর্মকর্তাদের পক্ষে সব প্রকল্প পরিদর্শন করা দুঃসাধ্য। একইভাবে আইএমইডির পক্ষ থেকে প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করা হলেও সব স্কিম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয় না। আইএমইডি কেবল ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ প্রকল্পের কাজ (স্কিম) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে।

টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ না করা : টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আইএমইডির কর্মকর্তারা অনেক বিষয় বুঝতে পারেন না, তাই পরিবীক্ষণও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না।

প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত : কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

৩. এলজিইডিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

৩.১ অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ

৩.১.১ *রাজনীতিকরণ*

এলজিইডিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রশাসনিক পর্যায়ে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রকল্প প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা, অন্যদিকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হচ্ছে।

৩.১.২ *স্বচ্ছতার অভাব*

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এলজিইডিতে জনবল ব্যবস্থাপনার অধীনে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়নি এবং প্রশাসনিক ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর তথ্য প্রকাশের অভাবে স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.১.৩ *প্রয়োজনীয় ও টেকনিক্যাল জনবলের অভাব*

এলজিইডির কার্যক্রম নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (এলজিইডি, আইএমইডি) প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার (দক্ষ জনবলের অভাব ও সীমিত নিরীক্ষার আওতা, বিশেষ করে রাজস্ব বাজেটের অধীনে ব্যয়ের নিরীক্ষার অভাব) কারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

৩.১.৪ *বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যতার অভাব*

প্রক্রিয়াগত কারণে এলজিইডির শিডিউল রেটের সাথে বাজারমূল্যের পার্থক্য দেখা যায়। ফলে ঠিকাদাররা বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

৩.১.৫ *দীর্ঘসূত্রতা*

প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা ও একাধিকবার সংশোধন, বাজেট বরাদ্দে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

৩.১.৬ *তদারকির অভাব*

এলজিইডিতে তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, জনবল ব্যবস্থাপনা, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম, বিভিন্ন লজিস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নেই।

চিত্র ৬.১ : এলজিইডিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

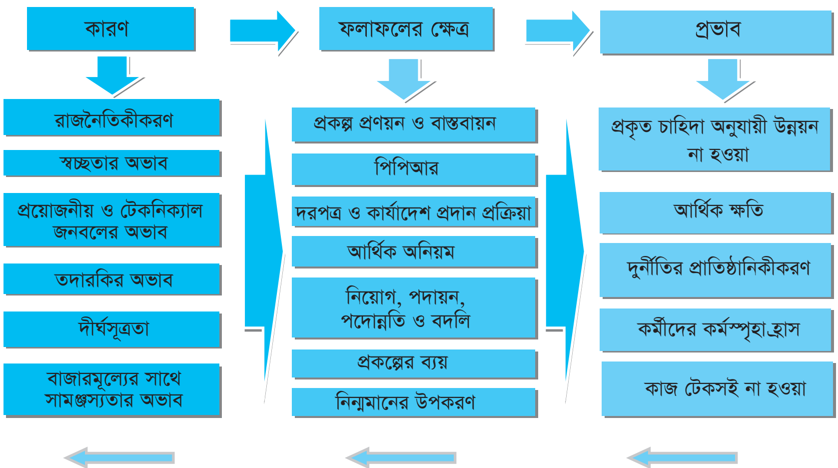

৩.২ এলজিইডির কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রভাব

৩.২.১ *প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন না হওয়া*

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী, রাজনীতিক ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের কারণে জনগণের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন হতে পারছে না, যার ভুক্তভোগী সাধারণ গ্রামীণ জনগণ।

৩.২.২ *আর্থিক ক্ষতি*

প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এসব উন্নয়ন সহযোগীর দেওয়া ঋণের প্রতিটি কিস্তির জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্ত পূরণ না করলে অর্থছাড়ের জন্য প্রতিটি কিস্তি থেকে 'কমিটমেন্ট ফি' হিসেবে জরিমানা কেটে নেওয়া হয়।

৩.২.৩ *দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ*

রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের দুর্বলতার কারণে এলজিইডিতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন- সিজিএ ও সিএজি কার্যালয়েও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে দেখা যায়।

৩.২.৪ *কর্মস্পৃহা হ্রাস*

জনবল ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এলজিইডির রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহা হ্রাস পায় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাদের কাছ থেকে জানা যায়।

৩.২.৫ *কাজ টেকসই না হওয়া*

বাজার স্থিতিশীল না থাকার কারণে ঠিকাদারদের কাজ করতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এবং নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। ঠিকাদারদের মতে, ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ঘুষ দিয়ে এই বাজেটে মানসম্মত কাজ করা সম্ভব নয়। কাজ শেষ না করে ঠিকাদার তার কাজের সব টাকা তুলতে না পারার কারণে অনেক সময় অর্ধেক কাজ করার পর কাজ বন্ধ রাখতে হয়। পরে আবার যখন কাজ শুরু করা হয় তখন কাজের গুণগত মান (টেম্পার) ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

৪. উপসংহার

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন ইতিবাচক, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি না থাকলে দক্ষতা, সক্ষমতা ও অর্জন আরও বেশি থাকতে পারত। এলজিইডিতে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির পেছনে দুই ধরনের নিয়ামক চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে বাহ্যিক নিয়ামক যেমন– দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (সিজিএ, সিএজি, আইএমইডি), অস্থিতিশীল বাজার, দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি এলজিইডির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অন্যদিকে জনবল ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, তদারকির অভাব, নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাব, স্বচ্ছতার অভাব (ই-প্রকিউরমেন্ট চালু না হওয়া) এলজিইডির দুর্নীতির অভ্যন্তরীণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

স্থানীয় উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এলজিইডিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন সুবিধা আদায় করার জন্যও এলজিইডিকে ব্যবহার করা হয়। এলজিইডিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলেও লক্ষ করা যায়।

৪.১ সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে এলজিইডির গৃহীত পদক্ষেপ

সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এলজিইডি ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার, মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

- জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদকরণ;
- নিয়োগ-প্রক্রিয়া শুরু; মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব খাতে আত্তীকরণ;
- অভিযোগ-সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (কৈফিয়ত তলব, বিভাগীয় মামলা);
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সব ক্রয় কার্যক্রম আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ই-গভর্ন্যান্সের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু;
- মান নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ (রোড কন্ডিশন সার্ভে, রাফনেস সার্ভে, ডিফ্লেকশন সার্ভে) ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;

- কাজের মান নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি;
- জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) মানচিত্রের উন্নয়ন;
- আঞ্চলিক শিডিউল রেট প্রবর্তন ও হালনাগাদকরণ;
- কার্যক্রমে (ডিজাইন, নির্মাণ) নির্দিষ্ট মানদ- ও আওতা নির্ধারণ।

৪.২ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ওপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে এলজিইডির সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৪.২.১ নীতিনির্ধারণী পর্যায়

১. সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন থেকে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ কাজ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন বা সংশোধনের সময় অপরিকল্পিতভাবে বরাদ্দহীন ও অননুমোদিত 'রাজনৈতিক' প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

২. এলজিইডির জন্য মানবসম্পদ ইউনিট গঠন করতে হবে, যা প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো পালন করবে। এই মানবসম্পদ ইউনিট জ্যেষ্ঠতার তালিকা হালনাগাদ করার সময় পুরোনো তালিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন করবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলি-সংক্রান্ত সুপারিশ করবে এবং সার্বিকভাবে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা করবে।

৩. উন্নয়ন বাজেটের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিয়োগবিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রকল্পের নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগত (টেকনিক্যাল ব্যক্তি দিয়ে করানো ও সরেজমিন) ও পরিমাণগত (বেশিসংখ্যক) মান বাড়াতে হবে।

৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

৫. এলজিইডির বিদ্যমান জবাবদিহির পদ্ধতি আরও শক্তিশালী করতে হবে।

৬. এলজিইডির নিজস্ব নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. এলজিইডির সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রতিবছর প্রকাশ করতে হবে; জ্ঞাত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন সম্পদের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. প্রকল্পভিত্তিক লজিস্টিকস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যেন প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে এসব লজিস্টিকস স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

৯. ব্যক্তিগত ও সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি নীতিমালা মেনে চলতে হবে; গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে তদারকি বাড়াতে হবে।

৪.২.৩ *প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত*

১০. যে প্রকল্পের মেয়াদ তিন বছরের বেশি হবে সেই প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

১১. বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্রে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

১২. ই-প্রকিউরমেন্ট ও ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সব পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.২.৪ *তথ্য প্রকাশ ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত*

১৩. এলজিইডির নাগরিক সনদ হালনাগাদ করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ এলজিইডির স্থানীয় পর্যায়ের সবগুলো কার্যালয় জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

১৪. এলজিইডির প্রতিটি প্রকল্প ও স্কিমের তথ্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

১৫. স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের (যেমন– সচেতন নাগরিক কমিটি) তদারকি ও সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক সামাজিক জবাবদিহির মাধ্যম ব্যবহার করে তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অর্থবিভাগ, ২০১২, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আকরাম, শম, ২০১২, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', টিআইবি, ঢাকা।

কাদের, আকমফ, ২০১০, 'প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়', পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ঢাকা (সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার শীর্ষক সেমিনারে ১৬-১৭ জুন ২০১০ তারিখে উপস্থাপিত প্রবন্ধ)।

পরিকল্পনা কমিশন, *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রতিবেদন*, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত)।

মাহমুদ, ত, ২০০৬, *করাপশন ডেটাবেস ২০০৫*, টিআইবি, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ২০১২, *এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-১২*, ঢাকা।

রায়, দ, ২০১২, 'হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : উত্তরণের উপায়', টিআইবি, ঢাকা।

Chadha, S, 1989, *Managing Projects in Bangladesh: A Scenario Analysis of Institutional Environment for Development Projects,* University Press Limited, Dhaka.

Economic Relations Division, 2010, 'GOB Project Approval Process: A Scoping Study', Ministry of Finance, Government of Bangladesh.

Fujita, Y, 2011, *What Makes the Bangladesh Local Government Engineering*

Department (LGED) So Effective?, JICA Research Institute, No.27; January.

Global Infrastrcture Anti-corruption Centre, http://www.giaccentre.org/documents/GIACC.CORRUPTIONEXAMPLES.pdf (8 February 2013).

Pallas, CL & Wood, J, 2009, 'The World Bank's Use of Country Systems for Procurement: A Good Idea Gone Bad?' *Development and Policy Review, 2009,* Overseas Development Institute, Blackwell Publishing, USA.

Rives, J M. & Heaney, M T, 1995, 'Infrastructure & Local Economic Development,' *Regional Science Perspectives;* Vol.25, No.1.

Sing, VK, 1983, *Infrastructure & Development in India: A study of Regional Variations,* CSRD/SSS, JNU, New Delhi.

Stansbury, C & Stansbury, N, 2008, 'Examples of Corruption in Infrastructure',

USAID, 1978, 'Department of Local Government & Community Development- Rural Roads Program, Republic of the Phillippines, Rural Roads Evaluation Report', Republic of the Phillippines.

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

নীনা শামসুন নাহার

১. প্রেক্ষাপট

জাতীয় যুবনীতি ২০০৩-এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব[২৫] শ্রেণিভুক্ত। লেবার ফোর্স সার্ভে (২০১০) অনুসারে ২০১০ সালে ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে বাংলাদেশে শ্রমশক্তি ছিল ৫ দশমিক ৬৭ কোটি, যাদের মধ্যে কর্মসংস্থান ছিল এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৫ দশমিক ৪১ কোটি ও বেকার ২৬ লাখ এবং বেকারত্বের হার ছিল ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, ২০১২ সালে যা ছিল ৫ শতাংশ। বেকারত্বের হার ৫ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে আংশিক এবং ছদ্ম বেকারত্ব রয়েছে। আইএলওর প্রতিবেদন অনুসারে এ ধরনের বেকারত্বের হার ৩০ শতাংশ এবং বাংলাদেশের বেকারত্ব যে হারে বাড়ছে, শ্রমশক্তি সেই হারে বাড়ছে না।[২৬] এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেকারত্বের সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। দেশের যুব শ্রমশক্তির[২৭] মধ্যে এই সমস্যা অপেক্ষাকৃত প্রকট।

রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি' নামে সাময়িক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে এ কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে সব জেলায় সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিটি বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর।

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির ওপর এ গবেষণা পরিচালনা করে। এ ছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যুবদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলেও এটি বাস্তবায়নে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির

---

* ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়ামে সাংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[২৫] ১৮-৩৫ বছরের বয়সসীমার মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশি সব নাগরিক যুব বলে গণ্য

[২৬] http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/bangladesh.pdf

[২৭] ১৫-৩৫ বছর বয়সী যুব শ্রমশক্তি (প্রাগুক্ত)।

তথ্য পাওয়া যায়। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। কর্মসূচির পাইলটিং পর্যায় চলাকালীন সরকারিভাবে করা মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র উঠে আসেনি এবং সফলতা অর্জনে কী ধরনের বাধা রয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়নি। ফলে গবেষণার মাধ্যমে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও অন্যান্য বিদ্যমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিকে আরও দক্ষ, সফল ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য এক ধরনের মূল্যায়ন ও এ ধরনের কর্মসূচির ওপর ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি পাইলটিংয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব সমস্যা থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব সে বিষয়ে সুপারিশের প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি পাইলটিংয়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়মের ধরন ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করা, সংশ্লিষ্ট অংশীজন-সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন চিহ্নিত করা, সার্বিকভাবে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা এবং সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশের প্রস্তাব করা। গবেষণায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মভাতা ও আর্থিক বিষয়াদি, সুবিধাভোগীদের ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, কর্মসূচির অর্জন ও প্রভাব প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। পাইলট কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি জেলার ১৯টি উপজেলার মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১১টি উপজেলা থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়) কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক, সুবিধাভোগী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণ। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, কর্মসূচি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য, কর্মসূচির বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেট, গণমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুমোদন পায়। পাইলটিং কাজের উদ্বোধন হয়

২০১০ সালে (কুড়িগ্রামে ৬ মার্চ, বরগুনায় ৬ মে, গোপালগঞ্জে ৩১ জুলাই)। এ কর্মসূচিতে পাইলটিং হিসেবে তিনটি জেলা নির্বাচন করা হয়- কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর ৯০টি কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমী ও নতুন ধরনের কর্মসূচি। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হয়, যা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মোট বরাদ্দের ১ শতাংশ। এ কর্মসূচির অধীনে কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ জেলার অনুকূলে ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট অর্থ বরাদ্দ ছিল ৮১৬ কোটি ২০ লাখ টাকা।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা (২০১০) অনুযায়ী পাইলট কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 'মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক বা যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা'। পাইলট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৪ জন এবং এর মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩১ অক্টোবর ২০১৩। পাইলট কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের ৫১ দশমিক ৬৫ শতাংশ এসএসসি, ৩৬ দশমিক ৮২ শতাংশ এইচএসসি, ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ স্নাতক এবং ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে শিক্ষা খাতে (৩৫ দশমিক ৮১ শতাংশ); এর পরই রয়েছে কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে ১৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ। পাইলট কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রংপুর বিভাগের সাতটি জেলার আটটি উপজেলায় এটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২.১ *কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অর্জন*

কর্মসূচির কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন চিহ্নিত করা যায়। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীদের সামাজিকভাবে সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি, যুবকদের সংঘবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, নারীর অংশগ্রহণ, নারীর বাইরে আসা ও কাজ করার মানসিকতা তৈরি, সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি, সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যুবদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় আর্থিক লেনদেন ও অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীর পরিবারে অর্থসহায়তা বৃদ্ধি, অর্জিত অর্থ সমিতির মাধ্যমে কাজে লাগানো, প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে অন্য ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটানো ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, বিকল্প আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে লাগার সুযোগ সৃষ্টি, সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে প্রশিক্ষণের সুযোগ, সরকারি অফিসে প্রবেশ ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার ভীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায়িত হয়েছে।

৩. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১ কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা

কর্মসূচির পরিকল্পনায় যুবদের সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বী করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়। সুবিধাভোগীদের যোগ্যতা নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন- কর্মসংস্থানহীন চিহ্নিত করার জন্য করা

জরিপে প্রকৃত বেকার- সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা, সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা-সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা, এক পরিবার থেকে কতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে, সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। কোন কোন খাতে সংযুক্তি দেওয়া হবে, সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা ও সংযুক্তি প্রদানের নীতিমালা না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও বাস্তবায়ন কাজের জন্য সম্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা ছিল না। এ ছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক সংযুক্তির পরিকল্পনা না থাকা, শূন্য পদে নিয়োগ না দেওয়ায় একই কাজে সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পৃক্ত থাকা, প্রতিষ্ঠানের কাজ শেখানো ও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা না থাকা, সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকা, পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা ও স্বচ্ছতার অভাব, পরিচয়পত্র বা কার্ড না দেওয়া উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা। কর্মসূচির ধারণাপত্রে গোপালগঞ্জ জেলা না থাকলেও পাইলটিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে দারিদ্র্য মানচিত্র (২০০৯ অনুযায়ী) জেলা নির্বাচনের কথা বলা হলেও গোপালগঞ্জ জেলার চেয়ে দরিদ্রতর জেলা রয়েছে।

৩.২ সুবিধাভোগী নির্বাচন-প্রক্রিয়া

ধারণাপত্রে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যার তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি প্রার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয়–ধারণাপত্রে পাইলটিংয়ের জন্য নির্ধারিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯৮৮ জনের বিপরীতে ৫৬ হাজার ৫৪ জন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বাজেট বাড়াতে হয়। এ ছাড়া জরিপ কার্যক্রমের ত্রুটির কারণে প্রকৃত বেকার নির্ধারণ করা হয়নি। নীতিমালায় উল্লেখ না থাকার কারণে আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের সদস্যরা সুযোগ পান এবং একই পরিবারের একাধিক সদস্য সুযোগ পান। এমনকি এক পরিবার থেকে সাতজন পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছেন বলে দেখা যায়; ভাতা-বাবদ শুধু এই পরিবারের জন্যই সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০ লাখ ৮৫ হাজার টাকা।

নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচনে দায়িত্বে অবহেলা উল্লেখযোগ্য–বেকার না হয়েও অনেকে কাজ পেয়েছে, যাদের মধ্যে নিয়মিত চাকরি ছেড়ে অংশগ্রহণ, একই সাথে একাধিক চাকরি করা, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে অংশগ্রহণ এবং ব্যবসার পাশাপাশি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বয়স, জেলার বাসিন্দা, শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদ দিয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং অন্যের নাম ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করেছে। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় দলীয় বিবেচনা ও পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব কাজ করেছে। যোগ্যতার শর্তপূরণ না হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি করে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায় করা হয়েছে। যোগ্যতার শর্তপূরণ হওয়ার পরও অর্থ আদায় করা হয়েছে, যেখানে সুবিধাভোগীদের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়েছে। এ ছাড়া অনিশ্চয়তা দূর করে নিশ্চিত চাকরি লাভের জন্য অর্থ প্রদান (বুকিং মানি) এবং কর্মসূচির সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানের পর আবেদন না করে পরে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম-প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আয়বর্ধক ও অঞ্চলভিত্তিক মডিউলের অভাব ছিল। অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে নীতিমালা ছিল না এবং প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরিতে কর্মসূচি পরামর্শকদের সম্পৃক্ত

থাকার কথা থাকলেও মডিউল তৈরির পর পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য খাতের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। বিশেষায়িত খাত যেমন- জননিরাপত্তা খাতে সংযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ ছিল না। ক্লাস নেওয়া বিষয়ক নীতিমালা ছিল না। ফলে একজন প্রশিক্ষকের অনেকগুলো ক্লাস নেওয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক (এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর) প্রশিক্ষণ না থাকা, বড় গ্রুপে প্রশিক্ষণ হওয়ায় কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক না হওয়ার মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতাবিহীন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং লেকচারশিট দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া প্রশিক্ষকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল তথ্য ও ধারণা প্রদান, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব, সুবিধাভোগী বেশি হওয়ায় কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ না থাকা সহ উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে নির্ধারিত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি না নিয়ে ক্লাসে আসায় সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে না পারা, স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ বাদ দিয়ে অধিক ক্লাস নেওয়া, সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণে না থেকে শুধু স্বাক্ষর করে চলে আসা, দলীয় প্রভাবের কারণে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনাগ্রহ প্রদর্শন, অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় বিবেচনা, কর্মসূচির জন্য লজিস্টিক ক্রয় করা সত্ত্বেও ব্যবহার না করা, অনুপস্থিত থেকেও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া (দলীয় বিবেচনা), উপস্থিত থাকার পরও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়া, স্বাক্ষরের সময়ের লিখিত অঙ্কের চেয়ে কম অর্থ পাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.৪ সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া

সুবিধাভোগীদের পছন্দনীয় (তিনটি) প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি না দেওয়া, জোরপূর্বক এমন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা যে খাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং কর্মপ্রতিষ্ঠান বদলের কারণে যাতায়াতে দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব না দেওয়া প্রধান সীমাবদ্ধতা। প্রথম দিকের ব্যাচে সুযোগ পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। পছন্দনীয় জায়গায় কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কর্মসূচি সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলেও নতুনভাবে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৫ বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া

কর্মসূচি বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের অনিয়মিত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। বছরে তিনবার ও বিলম্বে বরাদ্দ আসার কারণে ব্যাংকের সুদ সঠিকভাবে আসেনি বা কম এসেছে। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে সুবিধাভোগীরা নিজের জমানো টাকার চেয়েও কম পেয়েছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সুনির্দিষ্ট কারও দায়িত্ব না থাকার কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে গাফিলতি লক্ষ করা যায়। পরিদর্শন না করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যকরতা ও সক্রিয়তার অভাব ছিল। পরামর্শকদের সুপারিশ ও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। সুবিধাভোগীদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে পার্থক্য ও বৈষম্য এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারিত না থাকায় সুবিধাভোগীদের কাজে বৈষম্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনিয়ম।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও সুশাসনের ঘাটতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারণার অভাব লক্ষ করা গেছে। সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি পর্যায়ের সমিতিতে কাজ করানো হয়। কর্মসূচির সুবিধাভোগীরা যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করেন এবং তা জানার পরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মিত অনুপস্থিত ছিলেন অনেক সুবিধাভোগী। নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকার (সাত দিনের বেশি) পরও অভিযোগ না করা, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে নির্ভুল রাখা, পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না পেয়ে রিপোর্ট করলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিষয়টি গোপন রাখা হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিজের কাজে অবহেলা করেন ও কর্মসূচির কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। সুবিধাভোগীদের প্রতি শ্রমিক হিসেবে আচরণ করা হয় ও অসম্মান করা হয়। অনেক সুবিধাভোগী তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পড়াশোনার বিষয় গোপন রাখেন। বসা ও দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় সুবিধাভোগীদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। অনেক সুবিধাভোগী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন ও অনুপস্থিত থাকেন এবং কাজ না করেও কর্মভাতা গ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীরা অস্থায়ী কর্মসংস্থান হিসেবে কর্মসূচিকে বিবেচনা না করে আইনত না পারলেও স্থায়ীকরণের জন্য ঘেরাও কর্মসূচি ও স্মারকলিপি দেন। আর্থিক অনিয়মের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। একটি জেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে জমানো অর্থ কর্মকালীন শেষ হওয়ার আগে সুবিধাভোগীদের উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি (কেন্দ্রীয় ডেটাবেস না থাকা), মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদনকৃত অফিসগুলোর তথ্য ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাজ ও স্থান সংকুলান না থাকার পরও সংযুক্তি প্রদান (এক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫০-২০০) লোক নিয়োগ, বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিভ্রান্তি (সুবিধাভোগীদের ভীতি) উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা।

কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর সুদসহ জমানো টাকা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও সুদ না পাওয়া, ব্যাংকে কেটে রাখার নিয়ম না থাকলেও কেটে রাখা (কয়েকটি স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে কর্তন না করা), অনুপস্থিতির জন্য টাকা কেটে রাখার নিয়ম থাকলেও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে খুশি রেখে অনুপস্থিতির জন্য টাকা কর্তন বন্ধ রাখা (মাসে একবার হাজিরা দেওয়া), সুবিধাভোগীদের জন্য কারও সুপারিশ না থাকলে কর্মভাতা প্রদানে বিলম্ব, কর্মভাতার টাকা সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য প্রভাবশালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তৎপরতায় আগে পাওয়া, সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়, নিয়মিত উপস্থিত থাকার পরও নির্ধারিত কর্মভাতার চেয়ে কম পাওয়া এবং স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রিম আদায় (১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা), প্রশিক্ষণের মোট ভাতা নয় হাজার থেকে কম পাওয়া (এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা), পছন্দের প্রতিষ্ঠানে বদলির জন্য আদায় (এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা), সুদসহ সঞ্চয়ের অর্থ

৫০ হাজার থেকে কম পাওয়া (তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা), পাইলটিং এলাকায় পুনরায় নতুন কার্যক্রম শুরু হবে এ জন্য আদায় (১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা), বাধ্যতামূলক চাঁদা (১০০ টাকা) এবং স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি (৫-১৫ টাকা) আদায় উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া জাল কাগজপত্র ও সনদ তৈরির জন্য এবং অনিয়ম গোপন রাখার জন্য অর্থের লেনদেন হয়েছে । তারা বিভিন্ন প্রলোভনে (স্থায়ী হবে, কর্মসময় বৃদ্ধি পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, বিদেশ পাঠাবে) কর্মসূচিতে আর্থিক লেনদেন করে ।

৩.৬ বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন

কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যুব কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য, পরামর্শক, অংশীজন ও দালাল শ্রেণি, স্থানীয় নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ এবং যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া গেছে । বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরনগুলোর মধ্যে কর্মসূচির পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া, কাজ না দেওয়া ও কাজে না লাগানো, নিজের কাজে ফাঁকি, কমিটিগুলোর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা না করা, অকার্যকর সভা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দায়িত্বে অবহেলা, তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে দায়িত্বে অবহেলা, ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার, প্রকৃত বেকার না হয়েও অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ এবং কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে । এ ছাড়া নিয়মবহির্ভূতভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ, দলীয় লোক অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন জাল সনদ তৈরি ও প্রদান করে অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করার অভিযোগ ছিল ।

৪. কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা, অর্থসংকট, শর্ত বা নীতিমালা লঙ্ঘন, তথ্য সরবরাহে ঘাটতি উল্লেখযোগ্য । ফলে এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা, সুবিধাভোগী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার, প্রশিক্ষণে অনিয়ম, অপরিকল্পিত অংশগ্রহণ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা (কাজে না লাগানো, স্থায়ী কর্মীদের কাজ না করা, অবহেলা করা, অসম্মান দেখানো ইত্যাদি), সুবিধাভোগীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির (ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ, নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা, উপস্থিত না থেকে ও কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়া ইত্যাদি) উদ্ভব ঘটে । কর্মসূচির অনিয়মের ফলে পক্ষপাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে, অর্থের প্রবাহ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজ না করে অর্থ পাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি কর্মসূচির প্রত্যাশিত সাফল্য হ্রাস পেয়েছে ।

৫. কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেকারত্ব দূরীকরণে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ । এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তীকরণ প্রক্রিয়া ‘সাপ্লাই ড্রিভেন’ হওয়ার কারণে নিয়োগ

প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়। ফলে সরকার পরিবর্তনে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, সুবিধাভোগী নিয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয় সুস্পষ্ট না থাকা, লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করা, বাজেট-স্বল্পতা এবং অর্থছাড়ে বিলম্ব হয়েছে। তথ্যের সরবরাহের ঘাটতির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে অংশগ্রহণ ও প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে যোগসাজশ ও ক্ষেত্রবিশেষে জোর করে দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময় ঘটেছে। কর্মসূচির কিছু নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন- কর্মসূচির ওপর সুবিধাভোগী বা পরিবারগুলোর আর্থিক নির্ভরতা তৈরি, কর্মসূচি শেষ হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির আশঙ্কা। অর্থের সহজ প্রবাহের ফলে যৌতুক, মাদক ও ঋণগ্রস্ততার মতো কিছু সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাদ দিয়ে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়া, কর্মকালীন পড়াশোনা বন্ধ রাখার মতো নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৬. সুপারিশ

৬.১ কর্মসূচি পরিকল্পনা-সংক্রান্ত

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের আগে পাইলটিং পর্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা-সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে (আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীসহ নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কর্মসূচির মেয়াদ-পরবর্তীকালে করণীয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে সফল, দক্ষ ও যোগ্যদের পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে যথানিয়মে নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শক পদ কর্মসূচির পূর্ণমেয়াদে রাখতে হবে।

৬.২ বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত

৬.২.১ এলাকা নির্বাচন-সংক্রান্ত

৬. এলাকা নির্বাচনে দারিদ্র্য মানচিত্র অনুযায়ী প্রাধান্য নির্ধারণসহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৬.২.২ *সুবিধাভোগী নির্বাচন-প্রক্রিয়াসংক্রান্ত*

৭. সুবিধাভোগীদের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রকৃত বেকারত্বের মাপকাঠি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

৮. শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে না, কর্মসূচির এ শর্তাসহ অন্যান্য নিয়মাবলি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সংযুক্তি প্রদান করতে হবে, যেন কর্মসূচিতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

৬.২.৩ *আর্থিক বিষয়-সংক্রান্ত*

১০. পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে।

১১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাসিক ভাতা নিয়মিতভাবে মাসিকভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত ভাতা একই ভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১২. আর্থিক অনিয়ম বন্ধে সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

১৩. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধে প্রচারণা বাড়াতে হবে।

১৪. কর্মসময় শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সঞ্চয়বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে হবে।

৬.২.৪ *প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত*

১৫. প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর ও অঞ্চলভিত্তিক সময়বদ্ধ মডিউল থাকবে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের লেকচারশিট দিতে হবে।

১৬. প্রশিক্ষক হিসেবে টিম গঠনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যাচাই-বাছাই কমিটি তৈরি করতে হবে।

৬.২.৫ *পরামর্শক-সংক্রান্ত*

১৭. পরামর্শকদের নিয়োগ ও কাজে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শকদের তৈরি করা প্রতিবেদনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.৬ *অন্যান্য*

১৮. সুবিধাভোগী ও সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সব অংশীজনের ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি-সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রাপ্য অধিকার, করণীয় দায়িত্বসংবলিত একটি ম্যানুয়াল বুকলেট আকারে প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে।

১৯. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাফল্য ও ব্যর্থতার সূচক নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. কর্মসূচিটি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে দুই বছরমেয়াদি একটি অস্থায়ী উদ্যোগ। 'এটি সরকারি স্থায়ী কোনো চাকরি নয়'–এটি সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে।

২১. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২২. সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সাথে জড়িত সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুবিধাভোগী, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও এর কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থবছর ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪,'সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাজেট', ঢাকা।

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০০৯, 'ন্যাশনাল সার্ভিস : উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান, প্রাথমিক ধারণাপত্র', বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

আহমেদ, মো. ২০১২, 'মূল্যায়নে সব জেলায় চালুর সুপারিশ, তিন জেলাতেই আটকে আছে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর।

খান, শ, উদ্দীন, এজ এবং সাহা, সু ২০১২,'ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প, ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় কর্মীরা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ জুলাই।

দৈনিক প্রথম আলো, 'দুষ্টুমির এই শাস্তি!', ২২ এপ্রিল ২০১২।

দৈনিক প্রথম আলো, 'সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতে বরাদ্দ কমে গেছে, নেই সুনির্দিষ্ট নীতিমালা', ২১ জুন ২০১২।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার-২০০৮, দিনবদলের সনদ', ঢাকা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, শান্তি, গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০১০, 'প্রশিক্ষণ পাঠক্রম (মডিউল : ১-১০), ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি', ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০০৩ 'জাতীয় যুবনীতি ২০০৩', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০১১, 'ন্যাশনাল সার্ভিস : উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুব মহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা।

Asian Tribune, 2012,`Bangladesh to introduce an inovative job program for youths'viewed 22 April, <http://www.asiantribune.com/node/18263>.

bdnews24.com, 2012, `JS panel to inspect National Service Project', viewed 3 March, <http://www.bdnews24.com/pdetails.php?id=200153>.

bdnews24.com, 2012, National Service `to create 0.7m jouth jobs', viewed 3 March, <http://www.bdnews24.com/pdetails.php?id=1555192>.

Byron, RK, Parvez, S 2012, `5 Lakh more jobless in three Years', The Daily Star, 18 January.

Central Intelligence Agency 2012,`The World Fact Book 2012' Office of Public Affairs, viewed 30 October, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.html>.

Hoque, S 2012,`National Service Programme Evaluation Report' EADS, Dhaka.

http://www.dyd.gov.bd/nsp.php

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwep/download/bangladesh.pdf

http:/www.moysports.gov.bd/policy-youth.html.

Khatun, FK, Islam, T & Nabi, A 2010, `Executive Summary on Employment Generation for the Hardcore Poor and National Service, Challange of Effective Implementation', Centre for policy Dialogue (CPD) Bangladesh, Dhaka.

NNN-BSS, 2010,`Bangladesh, PM Launches Saturday national Servive Pilot Project', viewed 5 March, < http:news.brunei.fm/2010/03/05/ Bangladesh-pm-launches-saturday-national-servive-pilot-project'>.

Statistics Division, Ministry of Planning & Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 2011 `Report on Labour Force Survey 2010', August, Dhaka, < www. bbs. gov.bd>

The Daily Star, 'Social Safety Net Programmes falling short, large Percentage of poor left out', 18 January2013.

The World Bank (WB), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), World Food Programme (WFP) 2009,`Updating poverty Maps of Bangladesh', Dhaka <http://maps-of-bangladesh.blogspot.com/

বিটিসিএল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

দিপু রায়

১. ভূমিকা

সরকারি টেলিযোগাযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আগে বিটিসিএল বিটিটিবি নামে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও টেলিযোগাযোগ খাতকে বেসরকারি পর্যায়ে বিস্তার করার ফলে প্রতিযোগিতায় টিকতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিটিটিবিকে মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ১ জুলাই ২০০৮ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি 'বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)' করা হয়। গত ২৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে 'সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শিরোনামে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণায় বিটিসিএলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে এবং টিআইবি বিটিসিএলের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু সুপারিশ প্রদান করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো সুপারিশ বাস্তবায়নের তথ্য পাওয়া যায়নি। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল যাত্রার প্রায় ছয় বছর পার হলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে কোম্পানিটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারছে না। বিটিসিএল একটি কোম্পানি হিসেবে কেন কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তা চিহ্নিতকরণের জন্য টিআইবি আগের গবেষণার ধারাবাহিকতায় বিটিসিএলের বর্তমান অবস্থার ওপরে এ গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের কার্যকর পরিচালনায় সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও বিরাজমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরনগুলো চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা।

এটি একটি গুণবাচক গবেষণা। এতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে বিটিসিএল, সিএজি ও দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিটিসিএলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ অন্যান্য মুখ্য তথ্যদাতা। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ। এপ্রিল ২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত এই গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত সব তথ্য হালনাগাদকৃত।

২. বিরাজমান চ্যালেঞ্জ

সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন, পরিচালনা বোর্ডের সঠিক কাঠামো নির্ধারণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কার, আইনি কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

---

* ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায় প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত কার্যপত্রের সার-সংক্ষেপ।

নিয়োগের নীতিমালা নির্ধারণ, শেয়ার উন্মুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন হলেও বিটিসিএলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে বিটিসিএল একটি কার্যকর কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিটিসিএল কোম্পানির মতো কার্যক্রম পরিচালনা করতে আরও অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো।

২.১ পরিচালনা বোর্ডের চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএলের পরিচালনার জন্য টেলিযোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হলেও বোর্ডে মাত্র দুজন টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। বাকিদের ছয়জনই সরকারি কর্মকর্তা ও তাদের টেলিকম বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতই প্রাধান্য পায়। আবার পরিচালকদের বোর্ডে থাকার সুনির্দিষ্ট সময় না থাকায় তারা মন্ত্রণালয় বা এফবিসিসিআই ও আইসিএবির চেয়ারম্যানের পদ থেকে চলে গেলে বিটিসিএলের বোর্ড থেকেও চলে যান। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই পদে তারা খুব অল্প সময় থাকায় তাদের মধ্যে কোম্পানির প্রতি কোনো মালিকানাবোধ তৈরি হয় না। এ ছাড়া বোর্ড কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবায়নের সময় আবার সরকারি নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে পারফরম্যান্স বোনাস দেওয়া হয়েছিল তা সিএজির অডিট আপত্তি দেওয়ার কারণে ফেরত দিতে হচ্ছে।

২.২ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগে জটিলতা

বিটিসিএলে এখনো কোম্পানির অর্গানোগ্রাম কার্যকর না হওয়ায় ২০০৯ সালে প্রজ্ঞাপন অনুসারে চেয়ারম্যানকে আইনগতভাবে এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার নিয়মটি কার্যকর করা যাচ্ছে না। বিটিটিবি থাকাকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন একজন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা এবং তার গ্রেড ছিল ২। ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিষয়গুলো মীমাংসা না করে তাকে বিটিসিএলে এমডি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। বিটিসিএলের কর্মকর্তারা টেলিকম ক্যাডারের বাইরে কোনো ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগের বিরোধিতা করায় দুবার বিজ্ঞপ্তি দিলেও এখন পর্যন্ত কোনো নিয়মিত এমডি নিয়োগ হয়নি। যেসব ভারপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এমডি নিয়োগ হচ্ছেন, তারা এই পদে খুব অল্প সময় থাকেন এবং এমডির দায়িত্ব পালন করলেও কোম্পানির উন্নয়ন ও নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

২.৩ নতুন অর্গানোগ্রাম কার্যকর করার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল ঘোষণার পরে মার্কেটিং, সেলস, কাস্টমার কেয়ার, আইটি ও বিলিং, করপোরেট সার্ভিস, বিজনেস রিলেশন, সিকিউরিটি ও লিগ্যাল, এইচআরসহ নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। এই অর্গানোগ্রাম অনুসারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোম্পানিতে যোগ দিতে হলে তাদের মধ্যে চাকরির সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এসব অনিশ্চয়তার কারণে কোম্পানির হয়ে কাজ করা বা না করার প্রশ্নে তাদের সামনে অপশন তুলে ধরা হলেও কর্মকর্তারা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছেন না। এমতাবস্থায় ক্যাডার কর্মকর্তারা তাদের সরকারি চাকরি বজায় রাখার জন্য আদালতে মামলা

করলে আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১-এর মধ্যে তাদের আত্তীকরণ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় আপিল করলে ২০১৩ সালের মার্চ পর্যন্ত রায় স্থগিত করা হয়। আদালতের রায় অনুযায়ী টেলিকম ক্যাডারের কর্মকর্তাদের আত্তীকরণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় 'ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন' (ডট) গঠন করার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ডট গঠনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে সংসদ থেকে পাস হতে হবে, যা সময়সাপেক্ষ বিষয়। বর্তমানে এই ডট গঠনের প্রক্রিয়াটি আইন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট শাখা থেকে অনুমোদনের পরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। ডট গঠন হলেও কর্মকর্তাদের আত্তীকরণের জন্য লিয়েন ও প্রেষণের বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নিয়মে কিছু জটিলতা রয়েছে। বিটিসিএলে পদায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন নতুন আইনে এই জটিলতা থেকে গেলে কর্মকর্তারা বিটিসিএলে কাজ করতে আগ্রহবোধ করবেন না। আর 'ডট' গঠন ও নতুন আইন তৈরি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়নের বিষয়গুলো যত দিন না সমাধান হচ্ছে, তত দিন নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোম্পানির মতো করেও কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না।

২.৪ জনবল-সম্পর্কিত সমস্যা

বিটিসিএলের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব। কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেলস, মার্কেটিং, প্রচারণাসহ নতুন প্রযুক্তি যেমন–ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও এডিসিএল সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ লোক নেই। আবার জেলা, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার পর্যন্ত 'ইউনিভার্সাল সার্ভিস' অবলিগেশনের আওতায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নেই। বিশেষ করে সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী বা সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী (ডিপ্লোমা) পদে কাজ করার মতো প্রকৌশলীর অভাব প্রকট। বিটিটিবির সময়ে মঞ্জুরিকৃত পদ ছিল মোট ১৯ হাজার ০৬৬ টি কিন্তু বর্তমানে কর্মরত জনবল রয়েছে ৭ হাজার ৮০৮ (৪১শতাংশ) জন, যা বিটিসিএলের নতুন অর্গানোগ্রামের পদের (৮৭০৩) তুলনায় কম। অন্যদিকে বিটিসিএলে পুরোনো কিছু সেবা, যেমন- টেলিপ্রিন্টার, কল অপারেটর, টেকনিশিয়ান ও টেলিকম মেকানিক পদগুলো বন্ধ হলেও এই পদে লোক কর্মরত রয়েছে। ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলেও তারা চাকরি স্থায়ী করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

২.৫ আকর্ষণীয় বিপণন কৌশলের অভাব

কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এর পণ্যের প্রসার ঘটাতে আকর্ষণীয় প্রচারণা প্রয়োজন। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। বিটিসিএলের সেবার প্রচারণার জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ফেস্টুন তৈরি করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ২০১০ সালে বিটিসিএলের ৫৯ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন বিভিন্ন চ্যানেলে মাত্র তিন মাসের জন্য প্রচারিত হয়, যার মাধ্যমে মাত্র একটি সেবার চিত্র উঠে আসে। আবার কোম্পানি হিসেবে পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও এই প্রচারণার জন্য সিএজি অফিসের আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তার এ ধরনের আপত্তি মীমাংসা করাতে আড়াই বছর সময় লেগেছে। এই আপত্তির কারণে প্রচারণা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছেন।

২.৬ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিটিসিএলকে দুর্বল করা

১৯৯৮ সালে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০০৭ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসটেন্স টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিসেস' পলিসির (আইএলডিটিএস) মাধ্যমে তিনটি কোম্পানিকে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ের (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং তারা বিটিআরসিকে ট্যারিফের ৫১ দশমিক ৭৫ শতাংশ দিতে রাজি হয়। বিটিআরসি এ তিনটি কোম্পানির সাথে সাথে আইজিডব্লিউর লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএলকেও এই ৫১ দশমিক ৭৫ শতাংশ ট্যারিফ ধার্য করে। আগে বিটিটিবিকে এ ধরনের কোনো ট্যারিফ দিতে হতো না এবং আন্তর্জাতিক কলের পুরো অংশই বিটিটিবি আয় করত। আবার বাংলাদেশের কল ভলিউমের ওপর নির্ভর করে বিটিআরসি আর মাত্র চারটি কোম্পানিকে আইজিডব্লিউর লাইসেন্স প্রদান করার সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয় থেকে তা অমান্য করে কিছু অসাধু রাজনৈতিক নেতার স্বার্থ রক্ষায় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আরও ২৫টি কোম্পানিকে এই লাইসেন্স দেয়; যার মধ্যে কমপক্ষে ১০টি কোম্পানির মালিক হচ্ছেন বর্তমান সরকার বা আগের সরকারের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর আত্মীয়। এসব কোম্পানির বিটিআরসি, আসিএক্স ও এএনএসগুলোকে ট্যারিফের মোট ২ হশমিক ৬০২৫ সেন্ট প্রদান করতে হয়। বাকি অংশ থেকে সরঞ্জামাদি, জনবলের বেতন, বিপণন ইত্যাদির ব্যয় বাদ দিয়ে লাভ করতে হবে। এসব ব্যয় বাদে লাভজনক অবস্থানে যাওয়া কঠিন বলে তারা অবৈধ পথে কম দামে (সর্বনিম্ন ১ দশমিক ৫ সেন্ট প্রতি মিনিট) কল আনছেন, যা বিটিআরসির পক্ষে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে প্রতিদিন ৫৫ মিলিয়ন মিনিট আন্তর্জাতিক কল দেশে প্রবেশ করে, যার মধ্যে ৩৬ শতাংশ কল অবৈধ পথে প্রবেশ করে থাকে। এসব কোম্পানির অবৈধ কলের কারণে বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০১০ সালে বিটিসিএলের ইনকামিং কল ছিল প্রায় ৩৫৭ কোটি মিনিট, যা ২০১৩ সালে এসে কমে গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০৯ কোটি মিনিটে। ফলে বিটিসিএলের আয় কমে যাচ্ছে।

২.৭ বাজারে শেয়ার ছাড়ার চ্যালেঞ্জ

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে ঘোষণার প্রায় ছয় বছর পার হলেও বাজরে এর শেয়ার ছাড়ার উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। শেয়ার ছাড়ার যেসব শর্ত, যেমন–অডিট ও ব্যালেন্সশিটে কমপক্ষে তিন বছর লাভজনক অবস্থানে থাকা, কোম্পানির নিজস্ব জনবল থাকা ইত্যাদির কোনোটিই বিটিসিএলের নেই। এমতাবস্থায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাজারে শেয়ার ছাড়লেও তা বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় না-ও হতে পারে। অন্যদিকে বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনীহার কারণেও বাজারে শেয়ার ছাড়া যাচ্ছে না। ফলে বিটিসিএলে মূলধনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না, পরিচালনা পর্ষদেও কোনো পরিবর্তন আসছে না।

২.৮ বিরাজমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প অনুমোদনে বিটিটিবির সময়ের তুলনায় সময় কম লাগলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে আগের মতোই পিপিআর অনুসরণ করায় বেশির ভাগ প্রকল্পেরই সময়মতো কার্যক্রম শুরু ও শেষ হয় না। ফলে সময় উপযোগী সেবা না দিতে পারায় গ্রাহকসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। আবার মোবাইল সেবাদানের জন্য বিটিটিবি টেলিটক প্রকল্প ও টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে

সারা বিশ্বের সাথে যোগসূত্র করার জন্য সাবমেরিন কেবল প্রকল্পটিও সম্পন্ন করে। কিন্তু এ দুটি প্রকল্পকে আলাদা কোম্পানি করায় এর থেকে যে আয় হচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বিটিসিএল। অথচ এর ঋণের বোঝা বহন করতে হচ্ছে বিটিসিএলকেই। অন্যদিকে লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিটিসিএলের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জ বসানোর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে পার্বত্য এলাকায় ১৯টি এক্সচেঞ্জের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে এক্সচেঞ্জ প্রতি মাত্র দুই-চারটি সংযোগ রয়েছে।

২.৯ গ্রাহক সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা

বিটিসিএল ব্যয়বহুল কপার কেবলের মাধ্যমে টেলিফোন সেবা প্রদান করায় প্রায়ই কেবল চুরির কারণে গ্রাহকদের লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদিকে এক্সচেঞ্জের সংযোগ দেওয়ার সক্ষমতা থাকলেও কেবল-সংকটের কারণে গ্রাহকদের সংযোগ পেতে দেরি হয়। এক্সচেঞ্জ থেকে যেসব গ্রাহকের অবস্থান অনেক দূরে তাদের নিজেদের কেবল কিনে দিতে হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় রাস্তা কাটার কারণেও কেবল কাটা পড়ায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং বিচ্ছিন্ন লাইনের সংযোগ পেতেও দীর্ঘ সময় লাগে। আবার পুরোনো প্রযুক্তি হওয়ায় কোনো কোনো এক্সচেঞ্জ ব্যয় অনেক বেশি কিন্তু সে পরিমাণ আয় এক্সচেঞ্জগুলো থেকে আসে না এবং এর মাধ্যমে ভ্যালু অ্যাডেট সার্ভিস যেমন শর্ট মেসেজ পাঠানো ইত্যাদি সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া বিলিং পদ্ধতি অটোমেটেড ও প্রিপেইড না হওয়া, ওয়ারলেস লোকাল লুপের মাধ্যমে সেবা প্রদান না করায় ডাটা ও ভয়েসসহ অনেক সেবা একই সাথে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৩. বিটিসিএলের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

৩.১ আন্তর্জাতিক শাখার দুর্নীতি- বাংলাদেশে থেকে বিদেশি কোম্পানি সেজে রাজস্ব ফাঁকি

বিটিসিএলের পলিসি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানের জন্য বিদেশি ক্যারিয়ারগুলোর কাছ থেকে জামানত হিসেবে ইউএস ডলারে মূল্য পরিশোধের ব্যাংক গ্যারান্টি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তি, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখার অসাধু কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে অনেক ব্যবসায়ী বিদেশি কোম্পানি সেজে বাংলাদেশে বসে এই ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা ইউএস ডলারে ব্যাংক গ্যারান্টি না দিয়ে স্থানীয় মুদ্রায় ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দেয়। এসব কোম্পানি কিছু দিন ব্যবসা করে ব্যাংক গ্যারান্টির তুলনায় অনেক বেশি অঙ্কের বিল জমা করে, পরিশোধ না করে অফিস ফেলে চলে যায়। একই কোম্পানি নতুন নামে একই কাজের জন্য পুনরায় বিটিসিএলের কাছ থেকে কল অদান-প্রদানের অনুমতি নেয়। বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক শাখা বিষয়গুলো জানা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে পুনরায় তাদের কাজ দেয়। আন্তর্জাতিক কল আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের কাছে বিটিসিএলে বর্তমানে পাওনা রয়েছে প্রায় ৯৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে, যা প্রায় আদায়যোগ্য নয়।

৩.২ আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি -আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব আত্মসাৎ

বিটিসিএলের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কারিগরি ত্রুটির অভিযোগ

দেখিয়ে ফোন কলের রেকর্ড টেম্পারিং করা হয়। ২০১১ থেকে ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক কলের রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে বিটিসিএলের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দিনে কত মিনিট বৈদেশিক কল আদান-প্রদান হয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। কারণ হিসাব পাওয়ার যন্ত্র মহাখালী আইটিএক্সের সিডিআর (কল ডিটেইল্ড রিপোর্ট) পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় দুই বছর ধরে সিডিআর নষ্ট বলে অভিযোগ তোলা হয়। প্রতিদিন গড়ে আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা ছিল দুই কোটি ৫০ লাখ মিনিটেরও বেশি, সেখানে কল মুছে দেওয়ার কারণে কল কমে দাঁড়িয়েছে এক কোটি ৭০ লাখ মিনিট। মুখ্য তথ্যদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কল রেকর্ড টেম্পারিং এবং অন্যান্য আইসিএক্স ও মোবাইল কোম্পানিগুলোর পাওনা বাবদ বিটিসিএল প্রায় এক হাজার ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কল টেম্পারিংয়ের জন্য দুদক বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৭০০ কোটি টাকা আত্মসাতের চারটি মামলা দায়ের করে।

৩.৩ অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা

অবৈধ ভিওআইপি বন্ধ করার জন্য সরকার অনেক রকম পদক্ষেপ নিলেও বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নির্বিঘ্নে এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে। বিটিসিএলে ডিপ প্যাকেট ইন্সপেকশন (ডিপিআই) স্থাপনের মাধ্যমেই এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হলেও বিটিসিএল তা করেনি। টিডিএম প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদানের কারণে বিটিসিএলের ব্যান্ডউইথের সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়। ফলে অবৈধ পথে কতখানি ব্যান্ডউইথ ব্যবহৃত হচ্ছে তা ধরা কঠিন। এভাবে বিটিসিএলের গেটওয়ে ও অবকাঠামো অবৈধ পথে ব্যবহার করে অবৈধ ভিওআইপি করার সুযোগ দেওয়ায় অসাধু কর্মকর্তারা আর্থিকভাবে লাভবান হলেও বিটিসিএল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভিওআইপি একটি প্রযুক্তি এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবসা পরিচালনা করায় বিটিআরসির মনিটরিং প্রযুক্তিকে পাশ কাটিয়ে 'টানেলিং' করে অবৈধভাবে কল টার্মিনেশন করায় বিটিআরসির 'সিম ডিটেকশন বক্সে' অবৈধ কলের হিসাব জমা পড়ছে না। বর্তমানে অবৈধ ভিওআইপির জন্য বিটিসিএল ছাড়া আরও ৩৮টি আইআইজি কোম্পানির গেটওয়ে ব্যবহার হচ্ছে যার হিসাব বিটিআরসি রাখতে পারছে না।

৩.৪ অবৈধভাবে কোম্পানির ভূমি দখল

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিটিসিএলের ভূমির পরিমাণ দ্বিতীয়। সারা দেশে বিটিসিএলের ভূমি রয়েছে ১৮৪৩ দশমিক ২৯ একর। শুধু ঢাকাতেই রয়েছে ১৯৬ দশমিক ১৯ একর জমি। বিটিসিএলের এই ভূমি অনেক জায়গায়ই দখল হয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তাদের সহায়তায় কোম্পানির ভূমিগুলো এনওসি (No Objection Certificate) ও লিজ নিয়ে অবৈধ দখলদাররা দখল করে নিচ্ছে। এর মধ্যে কড়াইল, মতিঝিল, কক্সবাজারের কলাতলী, খুলনা ও কুমিল্লার লাকসামের জমি উল্লেখযোগ্য।

৩.৫ প্রশিক্ষণ, বদলি ও দায়িত্ব (দেখাশোনা) প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি

বিটিসিএল কোম্পানি হিসেবে এর প্রশিক্ষণ ও বদলির কোনো নীতিমালা নেই। বিদেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে এবং লবিং করে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কাজের সাথে সম্পর্কহীন বিষয়ে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। যেমন যিনি- কেবল নিয়ে কাজ করছেন, তাকে পাঠানো

হচ্ছে সুইচিং বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণে। আবার চাকরির মেয়াদ খুব অল্প সময় আগেও বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়।। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান তারা বিটিসিএলে কাজে লাগাতে পারেন না।

অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন পদে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত লবিংয়ের মাধ্যমে পদায়ন নিয়ে থাকেন। সদস্য ও পরিচালক- মেরামত ও সংরক্ষণ, বিভাগীয় প্রকৌশলী–আন্তর্জাতিক, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলী-ফোনস্ বহি, পরিচালক–ইন্টারন্যাশনাল, বিভাগীয় প্রকৌশলী-ইন্টারনেট (ব্যান্ড উইথ বণ্টন) এবং পরিচালক–প্রশাসন, বিভাগীয় প্রকৌশলী- বিল্ডিং এবং প্রকল্পের পদগুলোতে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় এসব পদে সবাই পদায়ন পেতে চান। অন্যদিকে ২৫তম বিসিএসের পরে বিটিসিএলে ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ বন্ধ থাকায় সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর অনেক পদ খালি রয়েছে। দুই-তিন ধাপ ওপরের এসব পদে অনেক উপসহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক ও টেকনিশিয়ানকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেখাশোনা করতে দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলোর মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় হওয়ায় অর্থ আত্মসাতের সুযোগও এখানে বেশি। আর এসব পদে নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পদায়ন নিয়ে থাকেন।

৩.৬ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অনিয়ম-দুর্নীতি

এ খাতে বার্ষিক বাজেটের অর্থ বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের খরচ ছাড়াও সিবিএ নেতা ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ে অবৈধভাবে প্রদান করতে হয়। এক কোটি টাকা বাজেট হলে সিবিএকে দিতে হয় প্রায় সাত লাখ টাকা এবং টাকার হিসাব ডিইকে মাসিক খরচের বিভিন্ন ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বা অন্য কোনোভাবে মেলাতে হয়। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাও অবৈধভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করেন। মুখ্য তথ্যদাতার মতে, 'বরাদ্দকৃত টাকার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট খাতের কাজে ব্যয় হয় আর বাকিটা অবৈধ খরচ হয়'। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রয়কৃত জিনিসের দাম বাজারদরের চেয়ে বেশি দেখানো হয়। যেমন–৮০০ টাকার কার্টিজ চার হাজার টাকায় কেনার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

৩.৭ পরিবহন খাতে দুর্নীতি

বিটিসিএলের গাড়ি মন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তারাও ব্যবহার করে। আর তার ব্যয় দেখানো হয় বিটিসিএলে। প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নথিপত্রে গাড়ি ভাড়া ও জ্বালানি ব্যয় দেখিয়ে রেন্ট-এ কারের যোগসাজশে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি গাড়ি বাবদ মাসিক ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এসব গাড়ি কখনোই প্রকল্পে আনা হয় না। অন্যদিকে বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসগুলোতে গাড়ির চালকদের মাসিক ১৬০ থেকে ১৮০ ঘণ্টা পর্যন্ত ওভারটাইম, এক মাস পরপর গাড়ি প্রতি ১৫ হাজার টাকা মেরামত ব্যয় এবং সিএনজিচালিত গাড়িগুলোতে প্রতি মাসে ৩০ লিটার তেল অতিরিক্ত প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। গাড়ি মেরামত ও জ্বালানি বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকায় পরিবহন শাখার লোকজন এই অর্থ প্রয়োজন না হলেও ভুয়া ভাউচর বানিয়ে ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করেন। এ ধরনের বিলে বিটিসিএলের কোনো কর্মকর্তা স্বাক্ষর করতে না চাইলে গাড়ি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

৩.৮ সিবিএর হস্তক্ষেপ ও অনৈতিক কার্যক্রম

বিটিসিএলে সিবিএর দৌরাত্ম্য এত বেশি যে, তারা যেকোনো দাবিতে কর্মকর্তাদের কার্যালয় ঘেরাও, দাবি মানতে নানা রকম হুমকি, টেবিল চাপড়ানো, মারধরসহ বিভিন্ন অশোভন আচরণ করে থাকেন। তাদের সামনে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মকর্তারা অসহায়। কন্ট্রাক্টরদের ফাইল খুলে দেখা এবং তাদের সিবিএ তহবিলে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা, কোম্পানির খালি জায়গায় ঘর তুলে ভাড়া দেওয়া, বাসা বরাদ্দের জন্য চাঁদা আদায়, বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের সিবিএ ইউনিটকে মাসিক তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য করা, সিবিএর অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করলে মন্ত্রণালয়কে বলে বদলি করানোর মতো অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সিবিএর লোকজন জড়িত।

৩.৯ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি

সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলীদের জন্য যে বাসা বরাদ্দ রয়েছে, সে বাসাগুলো পরিচালক, বিভাগীয় প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তারা দখল করে আছেন। এই বাসাগুলোর ভাড়া মাত্র ৩০০ টাকা হওয়ায় এসব কর্মকর্তা তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসায় বেশি ভাড়া দিয়ে থাকতে চান না। অথচ তারা বিটিসিএল থেকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারেই বাসা ভাড়া গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে প্রাইভেট মোবাইল, আইজিডব্লিউ, আইআইজি কোম্পানিগুলো বিটিসিএলের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অবৈধভাবে বিটিসিএলের অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। অবৈধভাবে সুবিধা দেওয়ার জন্য বিটিসিএলের খুলনা, সিলেট ও পাবনা কার্যালয়ের তিনজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আবার বিটিসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন বেসরকারি টেলিযোগাযোগ কোম্পানিতে কর্মরত থেকে বিটিসিএলের সুবিধা বেসরকারি কোম্পানিকে পাইয়ে দিচ্ছেন।

৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানি হিসেবে বিটিসিএল ঘোষণা হলেও সঠিক, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিটিসিএল কোম্পানির মতো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। আবার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় নতুন অর্গানোগ্রাম অকার্যকর এবং প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দেয়। টেলিযোগাযোগ নীতিমালা রাজনৈতিক নেতা ও প্রাইভেট কোম্পানির স্বার্থে অপপ্রয়োগের ফলে বিটিসিএলের রাজস্বের ওপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মন্ত্রণালয়নির্ভর পরিচালনা বোর্ড হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে বিটিসিএল। ওপরের জটিলতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় গ্রাহক হয়রানি করা ও রাজস্ব হারিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বিটিসিএল।

৫.সুপারিশ

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বিটিসিএলকে সম্পূর্ণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সুপারিশটি কার্যকর করা ও ওপরের

সমস্যাগুলো দূর করার জন্য টিআইবি বিটিসিএলের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের জন্য আরও কিছু সুপারিশ প্রদান করছে।

১. পরিচালনা বোর্ডে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করতে হবে। বিটিসিএলের পরিচালনা বোর্ড টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে।

২. বিটিসিএল, টেলিটক ও বিএসসিসিএল (সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লি.)–এই তিনটি কোম্পানিকে একীভূত করে একটি কোম্পানিতে রূপান্তর করতে হবে।

৩. যত দ্রুত সম্ভব বাজারে শেয়ার ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা ও পদায়নের জটিলতা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. নিয়োগের নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে দ্রুত নতুন অর্গানোগ্রাম অনুসারে লোকবল নিয়োগ করতে হবে।

৭. বিটিসিএলের নিজস্ব ক্রয়নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮. আইজিডব্লিউ অপারেটরদের অভিন্ন প্ল্যাটফরমের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বিটিসিএলের একটি আলাদা ইউনিট গঠন করতে হবে যার কার্যক্রম মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে, সেবামূলক উদ্দেশ্যে হবে।

১০. রাজস্ব বৃদ্ধির বাস্তবমুখী টার্গেট গ্রহণ করে সে সম্পর্কে কোম্পানির প্রতিটি স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে।

১১. ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি ‘গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. বিটিসিএলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং প্রতি বছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

১৪. নিরীক্ষার পরে চিহ্নিত অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচরণা ও কাস্টমার সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মনজুর ই খোদা ও জুলিয়েট রোজেটি

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিচালিত হয়। অন্যদিকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় কাস্টম স্টেশন, যার মাধ্যমে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং রপ্তানির প্রায় ৭০ শতাংশ শুল্ক-সংক্রান্ত কাজ সম্পাদিত হয়। স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অটোমেশনের সূচনা করা হয়, যার ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৪ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় গৃহীত 'চিটাগং ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট' ২০০৯ সালের ২৮ এপ্রিল শুরু হয়ে ২০১৩ সালের ৩০ জুন শেষ হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে এবং পরবর্তীকালে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টমসের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরূপণ ও এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানী গবেষণা পরিচালনা করে। এসব গবেষণায় প্রদত্ত অন্যতম সুপারিশ ছিল চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তন করে অনলাইন কার্যক্রম প্রবর্তন (মাহমুদ ও রোজেটি, ২০০৭; মাহমুদ ও রোজেটি, ২০০৮)। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অটোমেশনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউস উভয় প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন চালু হলেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে অটোমেশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া অটোমেশন বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে কার্যক্রম পরিচালনায় অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরার জন্য এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

---

* ২০১৪ সালের ১৪ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সময়কাল

বর্তমান গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে অটোমেশনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই প্রতিবেদনে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসে পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট অটোমেশনের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্সি, অফডক, শিপিং এজেন্সি, ফ্রেইট ফরোয়ার্ড ও মেইনলাইন অপারেটর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, ব্যবসায়িক নেতা ও অন্যান্য অংশীজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্দর কর্মকর্তা, মেইনলাইন অপারেটর, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও সাংবাদিকদের সাথে আটটি দলীয় আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন ধরনের দাপ্তরিক দলিল, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসের ওপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রম ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অটোমেশন : বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ওয়েবভিত্তিক অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে অনলাইনে আমদানি-রপ্তানি কনসাইনমেন্টের চালান-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও অন্যান্য নথিপত্র সরবরাহ এবং যাচাই-সাপেক্ষে ব্যাংকে অনলাইনে শুল্ক পরিশোধ করার মাধ্যমে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কাস্টম হাউসে অটোমেশন বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে যেকোনো স্থান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিল-অব-এন্ট্রি ও বিল-অব-এক্সপোর্ট ফরম পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। আমদানি প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আইজিএম দাখিলের পর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বিল-অব-এন্ট্রি ফরম পূরণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই ফরমে রেজিস্ট্রেশন নম্বর জেনারেট হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে কায়িক পরীক্ষার প্রয়োজন না হলে, অনলাইনে বিল-অব-এন্ট্রি ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের এইচএস (HS) কোড অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ হয়ে যায় এবং শুল্কের পরিমাণ বিল-অব-এন্ট্রি ফরমে সরাসরি চলে আসে। অনুরূপভাবে রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও বিল-অব-এক্সপোর্ট ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের ধরন ও মূল্য অনুসারে শুল্কায়ন-সংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ, সিঅ্যান্ডএফ- সংশ্লিষ্ট আয়কর ও ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ হয়ে যায়। শুল্ক নির্ধারণের পর শুল্ক কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে (রিলোড) আমদানিকৃত নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডেড পণ্যের নির্ধারিত শুল্ক অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পরিশোধ হয়ে যায়। একইভাবে রপ্তানি পণ্যের জন্য শুল্কায়ন-সংক্রান্ত সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকে।

কাস্টম হাউসে শুল্কায়নপ্রক্রিয়ায় অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শুল্কায়নপ্রক্রিয়াটি কাগজবিহীন এবং সম্পূর্ণ অনলাইনে পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। অটোমেশন চালুর পরও পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বা আমদানিকারকের প্রতিনিধিকে কাস্টম হাউসে যেতে হচ্ছে। অনলাইনে আইজিএম দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্রের হার্ড কপি জমা দিতে হচ্ছে এবং তা যাচাই সাপেক্ষে শুল্ক কর্মকর্তাদের সিল ও স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে। অনলাইনে আইজিএম দাখিল সম্ভব হলেও, তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনলাইনে দাখিল করার পদ্ধতি বা সুযোগ এখনো তৈরি হয়নি। এখনো রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ইজিএম নিবন্ধন নিশ্চিত করা যায়নি। বন্ড পণ্যের ক্ষেত্রে ট্র্যাকিং মডিউল প্রবর্তন করা হয়নি। আমদানি পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হয়নি। পণ্য পরীক্ষণের সাথে জড়িত বুয়েট, বিএসটিআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এখনো অটোমেশনের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডেড পণ্য এবং রপ্তানি পণ্যের শুল্ক পরিশোধ করা হলেও, কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্ক পরিশোধ চালু হয়নি। এ ছাড়া সার্বিক অটোমেশন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এলসি (Letter of Credit)-সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা ও সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ওয়েবভিত্তিক অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড চালু হলেও পূর্ণাঙ্গ অনলাইন শুল্কায়ন অথবা অংশীজনদের অনুপস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ শুল্কায়ন এখনো নিশ্চিত হয়নি। অনলাইনে বিভিন্ন স্তরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি, অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট করে, তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ও সিল সংগ্রহ করতে হয়। অটোমেশন-পূর্ববর্তী সময়ের মতো এখনো শুল্কায়নের বিভিন্ন স্তরে আমদানি-রপ্তানিকারক বা তাদের প্রতিনিধি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ রয়েছে এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূতভাবে 'আন্ডার টেবিল মানি' বা অবৈধ অর্থ দেওয়ার রীতি বিদ্যমান।

বর্তমানে কমার্শিয়াল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে একটি কনসাইনমেন্টের সব কাগজপত্র এবং প্রদত্ত তথ্য সঠিক থাকলেও শুল্কায়নপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় **১১**টি ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রায় তিন হাজার টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া জেটিতে কমার্শিয়াল পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য ছয়টি ধাপে কনটেইনার-প্রতি গড়ে ন্যূনতম প্রায় চার হাজার টাকা এবং নন-কমার্শিয়াল ও জেনারেল বন্ড পণ্যের ক্ষেত্রে কনটেইনার প্রতি গড়ে ন্যূনতম প্রায় এক হাজার ২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। তবে কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এই ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ আরও বেশি হয়ে থাকে। আমদানিকারক বা ব্যবসায়ী মূলত হয়রানি এড়াতে এই অর্থ দিতে বাধ্য হন, অর্থাৎ দুর্নীতির (Coercive Corruption) শিকার হন। তবে অনেক সময় আমদানিকারক শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে জাল নথি সরবরাহ অথবা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে শুল্কায়নপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্মকর্তাদের প্রদত্ত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ সর্বোচ্চ কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। শুল্ক ফাঁকির সুযোগ না থাকায় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধাপে কনসাইনমেন্ট প্রতি

ন্যূনতম প্রায় ৫০০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন অনুযায়ী, কাস্টম হাউসে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় ৩৬ দশমিক ৫ লাখ টাকা এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় ১১ লাখ টাকা, ন্যূনতম মোট প্রায় ৪৭ দশমিক ৫ লাখ টাকা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর একটি ধারণা দিতে সক্ষম।

পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আমদানিকারকের মধ্যে অনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে দালাল বা সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে কাস্টম হাউসে অবৈধভাবে কর্মরত কিছু 'ফালতু' বা 'বদি আলম' নামে পরিচিত শুল্ক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহায়তাকারী।

২.২ চট্টগ্রাম বন্দরে অটোমেশন : বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম বন্দরে অটোমেশন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্দরের কনটেইনার জেটি বা টার্মিনালগুলোর মাধ্যমে কনটেইনারের কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন ও বার্থিং বরাদ্দ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা। অটোমেশন বা সিটিএমএস বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানে ইন্টারনেট বা মোবাইলের মাধ্যমে টার্মিনালের বিভিন্ন ইয়ার্ডে কনটেইনারের অবস্থান-সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া কাস্টম হাউসের অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে আমদানি পণ্যের আইজিএম-সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্দর থেকে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় পণ্যের শুল্কায়ন-সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করতে পারছে। সর্বোপরি, জাহাজ বন্দরে বার্থিংয়ের আগেই কনটেইনার লোডিং-আনলোডিং ও ইয়ার্ডে সংরক্ষণ-সম্পর্কিত পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে। বন্দরে সিটিএমএস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে বন্দর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সিটিএমএস প্রকল্প বাস্তবায়নে ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল নেটওয়ার্ক, প্রকল্প হস্তান্তর-পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধতার অভিযোগ অন্যতম।

চুক্তি অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়নসাপেক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্প হস্তান্তর হওয়ার শর্ত থাকলেও হস্তান্তরের প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রকল্পের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি ডেটাসফটের মতে, এখনো বন্দরের বিলিং মডিউল তৈরি হয়নি এবং ৬৮টি এমআইএস রিপোর্টের মধ্যে ২০টি রিপোর্ট এখনো তৈরি হয়নি। অথচ চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বা শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের মূল সরবরাহকারী এসটিইকে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না করার কারণে প্রস্তুতকৃত সব মডিউল ব্যবহার বা সিটিএমএস প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের আগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, ইয়ার্ডে কনটেইনার স্ট্রিপিং (কনটেইনার খুলে পণ্য সরবরাহ) চালু থাকা, আনুষঙ্গিক লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, যেমন–সুশৃঙ্খল ইয়ার্ড, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রাকচালক ও পরিবহনশ্রমিক প্রভৃতির অভাব অন্যতম। অন্যদিকে অটোমেশন বা

সিটিএমএস ব্যবহারকারী বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতে, সিটিএমএস প্রকল্পের হস্তান্তর সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় মডিউল তাদের সরবরাহ করা হয়নি। বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম এখনো আগের প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সিটিএমএস প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের মতে, বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগুকর্মচারীদের একাংশের অনীহার কারণে সিটিএমএসের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। বন্দর থেকে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় ম্যানুয়াল পদ্ধতির কিছু প্রশাসনিক ধাপ হ্রাস পেলেও পুরো আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় ধাপগুলোর অধিকাংশ এখনো বিদ্যমান। পণ্যছাড় প্রক্রিয়ায় সাধারণত এলসিএল পণ্যের জন্য ১৬টি ধাপ, এফসিএল এবং অন-চেসিস ডেলিভারির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৯টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। পণ্যছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে সশরীরে উপস্থিত থেকে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অনুমতি গ্রহণ এবং যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত নথিপত্র ও প্রতিবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার মাধ্যমে পণ্যছাড় সম্পন্ন করতে হয়।

বন্দরের কর্মকর্তাগুকর্মচারীদের সাথে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সুযোগে বিভিন্ন অনিয়মকে পাশ কাটাতে পণ্যছাড় প্রক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অলিখিতভাবে নির্ধারিত হারে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। তবে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে উভয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত, সেখানে নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ অনিয়মের ধরন ও ওই অনিয়মের মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত বন্দর থেকে প্রতিটি এফসিএল বা এলসিএল কনসাইনমেন্টের পণ্যছাড়ের জন্য ন্যূনতম মোট প্রায় ৮০০ টাকা এবং অন-চেসিসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রায় এক হাজার ২০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে, প্রতিদিন বন্দরে ন্যূনতম মোট প্রায় ১৭ লাখ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে উত্তোলন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বাল্ক কার্গোর আমদানি পণ্যের ছাড় প্রক্রিয়া এবং রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ায় আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য সব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

পণ্যছাড় প্রক্রিয়ার মতো জাহাজ বার্থিং করার ক্ষেত্রেও ফিডার ভ্যাসেল অপারেটরদের বন্দর ও কাস্টম হাউসে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগুকর্মচারীদের নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। জাহাজের ওভার চালকের ক্ষেত্রে বন্দরে আসা ও ছেড়ে যাওয়া উভয় সময়ই প্রতি ইঞ্চি অতিরিক্ত ড্রাফটের জন্য ন্যূনতম প্রায় পাঁচ হাজার টাকা করে দিতে হয়। এ ছাড়া বাও ব্রিজ জাহাজের নেভিগেশন, নাইট নেভিগেশন ও ভাটায় নেভিগেশনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পাইলটকে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। নাইট নেভিগেশনের ক্ষেত্রে জাহাজের দৈর্ঘ্য ১৫৩ মিটার অপেক্ষা বেশি হলে সংশ্লিষ্ট পাইলট ও হারবার ডিপার্টমেন্টকে জাহাজপ্রতি ন্যূনতম প্রায় ২৫ হাজার টাকা এবং দিনে নেভিগেশনের জন্য জাহাজের দৈর্ঘ্য ১৮০ মিটারের অধিক হলে জাহাজের বার্থিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পাইলটকে জাহাজপ্রতি ন্যূনতম প্রায় ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। অফডকগুলো বন্দর থেকে আমদানি পণ্য গ্রহণ এবং বন্দরে রপ্তানি পণ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনুমতি গ্রহণের জন্যও সংশ্লিষ্ট টার্মিনাল কর্মকর্তা, গেট কাস্টমের জন্য সংশ্লিষ্ট অফডক সেকশন, বিভিন্ন শিফট অনুযায়ী গেট সার্জেন্ট, সিটিএমএস বুথ ও গেটের এন্ট্রিম্যানকে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়।

৩.১ উপসংহার

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউস উভয় প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন বাস্তবায়ন করা হলেও প্রায়োগিক সফলতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ বিদ্যমান। অটোমেশন বাস্তবায়নের কিছু ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের কার্যকর সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য পরীক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বন্দরে অটোমেশনের মাধ্যমে কনটেইনার ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়িত সিটিএমএসের প্রস্তুতকৃত মডিউলগুলোও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও বন্দরে অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে পণ্যের শুল্কায়ন ও ছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়-সংক্রান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্টতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩.২ সুপারিশ

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউসের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অটোমেশনের কার্যকর বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। অটোমেশনের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

১. শুল্কায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন সুবিধার আওতাভুক্ত করতে হবে।

২. বন্দরে সিটিএমএসের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সব মডিউল প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে হবে।

৩. বন্দরে বাল্ক পণ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য অটোমেশন বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনার খুলে পণ্য ডেলিভারি বন্ধ করতে হবে।

৫. স্বাধীন, নিরপেক্ষ তৃতীয় কোনো পক্ষের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে বন্দর ও কাস্টম হাউসের কর্মদক্ষতা ও অটোমেশনের কার্যকরতা পরিমাপে 'পারফরম্যান্স ইভাল্যুয়েশন' করতে হবে।

৬. কাস্টম হাউস ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. কাস্টম হাউস ও বন্দরে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধে এ-সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. কাস্টম হাউস ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. বছরে একবার সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

মাহমুদ, ত, রোজেটি, জ, চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা : ফলোআপ ডায়াগনস্টিক স্টাডি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৭ ।

মাহমুদ, ত, রোজেটি, জ, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস : সমস্যা ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৮ ।

http://allwebinfobd.blogspot.com/2011/10/historical-background-of-chittagong-port_7792.html accessed on December 2013.

http://chc.gov.bd/imp/ accessed on 28 April 2014.

Munisamy, S., and Sing, G.. (2011). Benchmarking the Efficiency of Asian Container Ports. African Journal of Business Management . Vol 5 (4), p1397-1407.

Overview 2013, Chittagong Port Authority.

www.containershipping.com accessed on 28 April 2014.

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. শাহ্নূর রহমান ও নাজমুল হুদা মিনা

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

ওষুধ জীবন রক্ষার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। ওষুধ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ওষুধশিল্প সংবেদনশীল হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর'। এ অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রয়সাধ্য মূল্যে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং দেশে ওষুধের উৎপাদনসহ আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধের গুণগত মান ও কার্যকরতা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে আমাদের দেশীয় চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ দেশীয় কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদন হচ্ছে। তৈরি পোশাক খাতের পর সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ওষুধশিল্পকে বিবেচনা করা হয়; যার গড় প্রবৃদ্ধির হার ২১ দশমিক ৩৯ শতাংশ। ওষুধ খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও মানসম্মত উৎপাদন ও ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রক এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাঠপর্যায়ে জনবল বৃদ্ধি, ওষুধ পরীক্ষাগার পুনঃস্থাপন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ, যা এখনো চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ভেজাল ও নকল ওষুধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে অভিযান জোরদার করা সহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০১৩ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অধিদপ্তরে একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম গঠন উল্লেখযোগ্য।

ওষুধ খাতে উপরিউক্ত সম্ভাবনা ও উদ্যোগ সত্ত্বেও কিছু সমস্যা ও অনিয়ম লক্ষণীয়। কিছু কিছু কোম্পানি মানসম্মত ওষুধ উৎপাদন করলেও বেশ কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে নকল, ভেজাল, নিম্নমান ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি এবং গুড ম্যানুফেকচারিং প্র্যাকটিস (জিএমপি) অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ওষুধের বাজার সম্পর্কে কিছু সাধারণ অভিযোগও রয়েছে। এগুলো হলো ওষুধশিল্পের দুর্বল তদারকি এবং পরিবীক্ষণ, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তদারকির অভাব, মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের ক্রয়-বিক্রয় এবং অবৈধ ড্রাগ স্টোরের বিস্তার উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসনের দুর্বল তদারকি এবং

* ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ ।

ব্যবস্থাপনাগত ঘাটতির কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে । এ ক্ষেত্রে ১৯৮০-২০১৩ সাল পর্যন্ত ভেজাল প্যারাসিটামল ওষুধ সেবনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা লক্ষণীয় । ভেজাল ও নকল ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সময় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ লক্ষ্যে- ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নকল, নিম্নমান ও ভেজাল ওষুধের উৎপাদন অব্যাহত থাকে । ওষুধ নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও এ প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের ওপর কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে । সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি জনগুরুত্বপূর্ণ যে খাতগুলো প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে থাকে স্বাস্থ্য খাত তার অন্যতম । ওষুধ খাত যেহেতু স্বাস্থ্য খাতেরই একটি অপরিহার্য অংশ, তাই উপরিল্লিখিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এ গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে ।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা । এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- ওষুধের উৎপাদন, বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতি ও আইন পর্যালোচনা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা ।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও ক্ষেত্র তুলে ধরা ।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে সুপারিশ প্রণয়ন করা ।

এ গবেষণায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন পাঁচ শ্রেণির ওষুধ কোম্পানির মধ্যে (অ্যালোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও হারবাল) অ্যালোপ্যাথি ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি গবেষণার আওতাভুক্ত । ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, সেবার ঘাটতি ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সব অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে চলমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয় ।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা । গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়

উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, কেস স্টাডি এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের উৎসগুলো হলো ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে); ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সদস্য, ওষুধ কোম্পানির মালিক ও কর্মকর্তা (রেগুলেটরি); ওষুধের দোকানের মালিক; বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (বিপিসি), বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাসট্রিজ (বিএপিআই) ও বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির (বিসিডিএস) প্রতিনিধি; পুলিশ কর্মকর্তা, চিকিৎসক, ওষুধ খাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, দাপ্তরিক নথি ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি মার্চ ২০১৪-জানুয়ারি ২০১৫ সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ ওষুধ প্রশাসনের আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে ওষুধ খাতের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে ওষুধ আইন, ১৯৪০; ড্রাগ রুলস, ১৯৪৫ ও বেঙ্গল ড্রাগ রুলস, ১৯৪৬; জাতীয় ওষুধনীতি, ২০০৫ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব আইন, বিধি ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিচে ওষুধ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান নীতি ও আইনের সীমাবদ্ধতা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলো।

২.২ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়

ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। এ দুটি আইনে মানবস্বাস্থ্যের জন্য সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ–মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে আইনিভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই এবং এসব কাজ ওষুধ প্রশাসনের কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে কেউ নিম্নমানের ও ঝুঁকিপূর্ণ মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

অপরদিকে 'জাতীয় ওষুধ নীতি, ২০০৫'-এ ওষুধ প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও গুরুত্বারোপ করা হলেও এ নীতির কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ নীতিতে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ ও অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনার অস্পষ্টতা রয়েছে। এ ছাড়া দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুতে প্রণোদনার ক্ষেত্রে নীতিগত নির্দেশনারও ঘাটতি লক্ষণীয়। এ নীতিতে আমদানিকারকদের চাহিদা অনুযায়ী যেকোনো ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মূল্য

নিয়ন্ত্রণ ও হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পদক্ষেপের ঘাটতিসহ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ উৎপাদনে কোম্পানিগুলোর অনাগ্রহ বৃদ্ধির ঝুঁকিও লক্ষণীয়। আবার এ নীতিতে আমদানিকৃত ওষুধ নিবন্ধনের জন্য বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি ও বায়োইক্যুইভ্যালেন্স তথ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও বায়োলজিক্যাল ওষুধের অত্যাবশ্যকীয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল উল্লেখ করা হয়নি, এর ফলে দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ওষুধের আমদানির ঝুঁকি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

২.৩ ওষুধ-সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া উল্লেখ না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে শুধু ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করার কথা উল্লেখ করা হলেও এর গঠন, কর্মপ্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা আইনিভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। এ ছাড়া অন্যান্য কমিটির গঠন, কর্মপ্রক্রিয়া, সদস্যসংখ্যা ও সদস্যদের যোগ্যতা আইনে উল্লেখ না থাকায় কমিটিগুলোতে রাজনৈতিক বিবেচনায় সদস্য নির্বাচন, সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও কমিটিগুলোর দায়িত্বপালনে সাংঘর্ষিকতার ঝুঁকি তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২.৪ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হলেও তার অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপনের উল্লেখ না থাকা

ওষুধ আইন, ১৯৪০-এর ধারা ৬ (১)-এ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ বাস্তবসম্মত হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওষুধশিল্পের বিস্তার ও উৎপাদনের ব্যাপকতায় একটিমাত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অথচ পরবর্তী সময়ে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের বাস্তবতাও এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২.৫ ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময় সুনির্দিষ্ট না থাকা

১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের ধারা ১১তে সরকার কোনো ওষুধের কাঁচামালের মূল্যের নিরিখে ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণক্রমে সরকারি গেজেট প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গেজেট প্রকাশের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। নিয়মিতভাবে গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় উচ্চ দামে ওষুধ বিক্রি করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০০০ সালে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৬ বিধিমালা তৈরি ও হালনাগাদ না করা

ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ সালের ১২ জুন প্রণীত হয়। এ অধ্যাদেশের এখনো পর্যন্ত বিধিমালা তৈরি করা হয়নি। অপরদিকে ওষুধ আইন, ১৯৪০-এর বিধিমালার (ওষুধ বিধিমালা, ১৯৪৫ এবং বেঙ্গল ওষুধ বিধমালা, ১৯৪৬) পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হালনাগাদ করা হয়নি। যেহেতু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিমালা নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে, তাই ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর বিধিমালা তৈরি না হওয়া ও ওষুধ আইন, ১৯৪০-এর বিধিমালা হালনাগাদ না হওয়ায় আইন প্রয়োগের

ক্ষেত্রে অনেক সময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

২.৭ ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ না থাকা

ওষুধের অযৌক্তিক ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ওষুধ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহার রোধ করা সম্ভব। ওষুধ আইন, ১৯৪০ এবং ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ওষুধ বিক্রিতে ব্যবস্থাপত্র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে খুচরা ওষুধ বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২.৮ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরি ও অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে প্রস্তাবের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দণ্ডের উল্লেখ না থাকা

নিম্নমান, ক্ষতিকর অথবা নকল ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে বিভিন্ন দন্ডের বিষয় উল্লেখ থাকলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে কোনো দন্ডের বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে, ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে চিকিৎসক কর্তৃক অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে প্রস্তাব করা নিষেধ করা হলেও এ ক্ষেত্রে নিষেধ অমান্য করা হলে কোনো ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে অনুমোদনহীন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করা হলে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

২.৯ আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা

ওষুধ আইনে শাস্তি ও জরিমানার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব বিবেচনায় কঠোর দণ্ডের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ আইন, ১৯৪০-এ অনুমোদনহীন, ভেজাল, নকল ও মিসব্র্যান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা অনির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আবার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ- ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২তে সরকারি ওষুধ চুরির ক্ষেত্রে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান এবং ভেজাল, নকল ও মিসব্র্যান্ডেড ওষুধ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রিতে সমপরিমাণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং শাস্তি ও দণ্ডের পরিমাণে অসামঞ্জস্যতার কারণে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ও স্থায়ীভাবে অপরাধ দমনে ব্যর্থতা তৈরি হয়।

৩. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

৩.১ অবকাঠামোগত সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসের জন্য নিজস্ব কোনো অফিস ভবন নেই। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী কার্যালয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলার তদারকিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ মোট ৫২টি জেলায় অফিস রয়েছে। ফলে কার্যালয়বিহীন জেলাগুলোতে তদারকির কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অপরদিকে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে জায়গার অপ্রতুলতা রয়েছে। পর্যাপ্ত

জায়গার অভাবে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা যেমন- অফিস ফাইল ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, ওষুধের নমুনা সংরক্ষণ ও সেবাগ্রহীতাদের সেবা দেওয়ায় সমস্যা হয়।

৩.২ তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি

ওষুধের বাজার পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ঘাটতি লক্ষণীয়। সাধারণত কোনো কোম্পানি পরিদর্শনে ওষুধ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে কর্মকর্তা ও কোম্পানির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ ও এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারে প্রেরণকৃত নমুনার কিছু অংশ পরীক্ষার অনুপযুক্ত হয়।

৩.৩ জনবলের স্বল্পতা ও সমস্যা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় জনবল স্বল্পতা লক্ষণীয়। দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে কমপক্ষে একজন করে ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক ও একজন ঔষধ পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন অথচ ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিসসহ মাঠপর্যায়ে বর্তমানে ৫৮ জন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন ঔষধ পরিদর্শক কর্মরত রয়েছেন। অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর প্রায় চার বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সব পর্যায়ে জনবল নিয়োগ হয়নি। সার্বিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৩৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের অর্গানোগ্রাম এখন পর্যন্ত অনুমোদন হয়নি। পুরোনো পরীক্ষাগারের অপ্রতুল জনবল দ্বারা এ পরীক্ষাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগার, চট্টগ্রামে ২০টি টেকনিক্যাল পদের বিপরীতে মাত্র পাঁচজন কর্মরত রয়েছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনবলের স্বল্পতায় ওষধ প্রশাসন প্রতিবছর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ওষুধের বাজার তদারকি করতে ব্যর্থ হয় এবং ওষুধ পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির কারণে দেশের বাজারের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (প্রতিবছর প্রায় ৭০ শতাংশ) ওষুধের মান পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

৩.৪ কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ের কিছু কর্মকর্তাসহ ওষুধ পরীক্ষাগারের টেকনিশিয়ানদের পেশাগত জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে তারা ওষুধের বাজার তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারের না। ঔষধ তত্ত্বাবধায়কদের জন্য নিয়মিত কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না। নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু না থাকায় তারা ওষুধের বাজারের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, বিদ্যমান আইনকানুন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হতে পারেন না।

৩.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে দুর্বলতা

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সেবা-সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও একক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। ফলে অধিদপ্তরের

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথিব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা ও অপূর্ণতা থাকে। এ ছাড়া ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের সেবা-সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি ও সন্নিবেশিত তথ্য হালনাগাদ না হওয়া লক্ষণীয়। এ কারণে সেবাগ্রহীতারা, বিশেষ করে ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় (ওষুধ অনুমোদন ও বাতিল-সংক্রান্ত তথ্য, কারখানা পরিদর্শন-সংক্রান্ত তথ্য, কমিটিতে বিভিন্ন আবেদনের অনুমোদন-সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি) ও হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন।

৩.৬ কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যনির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালকসহ চারজন পরিচালকের নেতৃত্বে ৩৭০ জনবল-কাঠামো দ্বারা ঔষধ প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টনের কাঠামো তৈরি করা হলেও এখন তা কার্যকর করা হয়নি এবং এ ক্ষেত্রে অত্র অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালক তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ বিভাজন করে থাকেন। কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে কোম্পানি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কর্মকর্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী অর্থাৎ সুইট অক্ষর দ্বারা কোম্পানি নির্বাচন করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় ও ছোট কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণে প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যোগসাজশ হয়ে থাকে। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক তাদের পছন্দনীয় কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্যও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে সমঝোতামূলক দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ঝুঁকি তৈরি হয়। সার্বিকভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জবাবদিহির ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.৭ কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময়ে পরিচালক ও মহাপরিচালক কর্তৃক ইচ্ছানুযায়ী কর্মবণ্টন ব্যবস্থা চালু থাকায় কর্মী ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মাঠপর্যায়ে কর্মরত ঔষধ তত্ত্বাবধায়কদের নিয়মিত মনিটরিং ও জবাবদিহির কাঠামো অনেক সময় অকার্যকর হয়ে থাকে। মাঠপর্যায়ে নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ন্যূনতম দুদিন পরিদর্শনে যাওয়ার বিধান থাকলেও সব ক্ষেত্রে তা পালন করা হয় না এবং কিছু ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক নিয়মিত দোকান পরিদর্শন না করে রিপোর্ট দেন। আবার মাঠপর্যায়ের কোনো কোনো তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে নিজ কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত না থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কার্যসম্পাদন করার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জ্ঞাত থাকলেও দুর্বল জবাবদিহি কাঠামোর কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা সরকারি চাকরির নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো কোনো কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ওই কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করেন। আবার এ ধরনের কোম্পানির কোনো কার্যক্রম আইনবিরোধী হলেও কর্মকর্তাদের প্রভাবে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। পরামর্শক হিসেবে এ ধরনের অনৈতিক দায়িত্ব পালন করায় কিছু সৎ ও উদ্যমী কর্মকর্তার মধ্যে অসন্তোষ ও দায়িত্ব পালনে অনীহা তৈরি হয়

এবং সর্বোপরি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির কাঠামো দুর্বল করে।

৩.৮ নিজস্ব আইনজীবী না থাকা এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত মামলা পরিচালনার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এ ক্ষেত্রে ঔষধ তত্ত্বাবধায়কদের কোর্টে মামলা করার পর পিপির (পাবলিক প্রসিকিউটর) ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মামলার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পিপি পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে পিপি নানা ধরনের সরকারি মামলা পরিচালনায় ব্যস্ত থাকার কারণে তার পক্ষে গুরুত্বসহকারে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন সম্ভব হয় না। ফলে তিনি বিবাদীপক্ষের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার আইনজীবীর সাথে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারেন না এবং সার্বিকভাবে ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং অপরাধ করার পরও তারা ছাড়া পেয়ে যায়। আবার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে ঔষধ তত্ত্বাবধায়কদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সংগঠন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অনেক সময় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিছুসংখ্যক ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক এসব ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমঝোতামূলক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে যোগসাজশ করে থাকেন।

৩.৯ ওষুধ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা

ওষুধ আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ওষুধ আদালত বা নিম্ন আদালতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। সাধারণত ওষুধ পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়করা ঔষধ আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্ট বিবাদীপক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে আসামি সশরীরে কোর্টে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করেন। নিম্ন আদালত থেকে প্রাপ্ত এ সুযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়ই বিবাদী ওষুধ কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পেশা বা ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষুণ্ন হয়েছে দাবি করে বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বিষয়টি আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সংশ্লিষ্ট মামলা-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম স্থগিত রাখেন। বিবাদীপক্ষের এ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেক সময়ই দীর্ঘ সময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেক সময় উচ্চ আদালত রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদীপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শনসহ নমুনা সংগ্রহের সব কার্যক্রম স্থগিত রাখেন। ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন অব্যাহত রাখেন।

৩.১০ ওষুধ প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর কার্যকরতার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওষুধ-সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি কমিটি সহায়তা প্রদান করে। এ কমিটিগুলো মূলত ওষুধ খাতের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষণীয়। এগুলো হলো নতুন পুনর্গঠিত অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন অ্যাডভাইজরি কমিটি ব্যতীত বাকি

কমিটিগুলোর সভা অনুষ্ঠানের সময়কাল ও বাধ্যবাধকতা উল্লেখ না করা, কমিটিগুলোর গঠনপ্রক্রিয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণ না করা, কমিটিগুলোতে ওষুধশিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য বিস্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যের অভাব এবং সভায় কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, একটি কমিটি ব্যতীত সবগুলোতেই ওষুধশিল্প সমিতির প্রতিনিধিদের আধিপত্য রয়েছে। কমিটিগুলোতে শিল্প সমিতির আধিপত্য থাকায় সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মালিকই সদস্য হিসেবে তার কোম্পানির ওষুধের দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে কমিটিগুলোতে প্রথম শ্রেণির খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকে, এ ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ, কাঁচামাল আমদানি অথবা প্রকল্প মূল্যায়ন সব ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে, যা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন অংশীদারত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যাহত করে। কমিটিগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কমিটি সদস্য নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্কিত কোম্পানির ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতা থাকে। ফলে কোনো নতুন প্রকল্প অনুমোদনে বা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তা বাস্তবায়নে কমিটির অন্য সদস্যদের প্রভাবিত করা হয়।

৩.১১ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধশিল্পের ব্যবস্থাপনা ও বিকাশে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে জনবল ও অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে জনবল-সংক্রান্ত ঘাটতি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা গত দুই দশক ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় থাকত না। পরিদপ্তর থেকে অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার পর চার বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত অনুমোদিত জনবলের ৩৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে। অপরদিকে কাজের পরিধি ও ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক একটি মূল্যায়নে ৯৪৭টি পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এটি উপেক্ষিত হয়। উপরন্তু অধিদপ্তরে উন্নীত হওয়ার সময় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে ৫৭০টি পদের চাহিদাও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপেক্ষিত হয়। জনবল-সমস্যা উপেক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অনেকেই নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সদিচ্ছার ঘাটতিকে দায়ী করেন। এ ছাড়া ওষুধ পরীক্ষাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ এখন পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের আওতায় রাখা হয়েছে, অথচ এটি বর্তমানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন রয়েছে। ফলে বর্তমানে ওষুধ পরীক্ষাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী রিএজেন্ট ক্রয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া এ অধিদপ্তরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুমোদিত বাজেটের গড়ে মাত্র শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের জন্য ব্যয় করা হয় এবং এ বাজেটের বেশির ভাগই খরচ হয় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। কিন্তু উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কম। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে এই অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা আনয়নে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অপরদিকে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে বিদ্যমান আইনে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ ছাড়া বর্তমান আইন দুটি সমসাময়িক বিষয় ও

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। কিন্তু এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের ওষুধ আইনের বিধিমালা হালনাগাদ না করা এবং ১৯৮২ সালের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের বিধিমালা তৈরি না করা লক্ষণীয়। ঔষধ প্রশাসন-সংশ্লিষ্ট সবগুলো কমিটিতেই (বিশেষ করে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ড্রাগ কন্ট্রোল টেকনিক্যাল সাব কমিটি) নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে ওষুধ শিল্প সমিতির এক বা একাধিক প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। আগে কোনো কমিটিতে ওষুধ শিল্প সমিতির এত বেশি প্রতিনিধি ছিল না। কারণ এতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এক কোম্পানির মালিক আরেকটি কোম্পানির প্রকল্প মূল্যায়ন করছেন কিন্তু তারা ওষুধের বাজারে একে অপরের প্রতিযোগী। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে কিছু ওষুধ কোম্পানির প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অনৈতিক প্রভাব ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৪. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

৪.১ ওষুধ কারখানার লাইসেন্স প্রদান

প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। মূল্যায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা আহ্বানে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ করা এবং আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ব্যক্তির প্রকল্প দ্রুত কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্প অনুমোদনে কমিটির কিছু সদস্যের মধ্যে সিন্ডিকেট গঠনের অভিযোগ লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে কমিটির কিছু সদস্য নিয়মবহির্ভূত অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করে প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অপরদিকে প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমাদনের আগে প্রকল্প পরিদর্শনে অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ধেক পূরণ না হলেও অনুমোদন প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা সরকারি চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে কোম্পানিগুলোতে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ কারণে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কোনো প্রকল্পের লাইসেন্স অনুমোদন করার বিষয় উত্থাপিত হলে তাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করে।

৪.২ রেসিপি অনুমোদন

রেসিপি অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ও কিছু ওষুধ কোম্পানির অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। অধিদপ্তর কর্তৃক রেসিপির উপাদান সব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে যাচাই না করা এবং এই সুযোগে কিছু কোম্পানি বিরুদ্ধে বেশি লাভের আশায় অনুমোদিত রেসিপির উপাদানে পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রেসিপি কমিটির সভা আহ্বানে আর্থিক লেনদেন না হলে সভা আহ্বানে কালক্ষেপণের অভিযোগও পাওয়া যায়। সাধারণত রেসিপি অনুমোদনের সভা আহ্বানসহ এ-সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে একজন দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকলেও সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক বা মহাপরিচালককে প্রভাবিত করে এ-সংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৩ ওষুধ নিবন্ধন

ওষুধ নিবন্ধনে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং কোম্পানির যোগসাজশে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ কারখানাগুলোর সংযুক্তিতে নির্দেশিত ওষুধ সঠিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও কিছু পরিদর্শক কর্তৃক কোম্পানির সাথে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ওষুধের নিবন্ধন দেওয়া হয়। অপরদিকে ওষুধের নাম অনুমোদনেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণের অভিযোগ লক্ষণীয়। ওষুধের সংখ্যাভেদে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ওষুধের অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার নতুন ওষুধের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো অনুমোদনহীন ওষুধ উৎপাদন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসনের কোনো কোনো কর্মকর্তার যোগসাজশে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।

৪.৪ ওষুধের ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল ও মোড়ক অনুমোদন

ওষুধের ফয়েল, লেবেল, ইনসার্ট ও মোড়ক অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যেমন– ওষুধের বাণিজ্যিক ও জেনেরিক নাম, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ, ওষুধের উপাদান, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ডোজের পরিমাণ ইত্যাদি সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয় না। এই সুযোগে কিছু স্থানীয় ও ছোট কোম্পানি খ্যাতনামা বড় কোম্পানিগুলোর বাণিজ্যিক নাম ও মোড়কের ডিজাইন নকল করে থাকে। ওষুধ আইন অনুযায়ী ওষুধের বাণিজ্যিক নাম, মোড়কের ডিজাইন কোম্পানিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কথা কিন্তু অনুমোদনের সময় কিছু ওষুধ কোম্পানি ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশে এই নিয়ম না মেনেই ঘুষের বিনিময়ে অনুমোদন নিয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এ-সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্রের আবেদন করা ফাইল আটকে রাখেন এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো তাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনায় সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।

৪.৫ ব্লকলিস্টের অনুমোদন

ব্লকলিস্ট অনুমোদনে নিযুক্ত কিছু কর্মকর্তা অনেক সময়ই ব্লকলিস্টে উল্লিখিত মালামাল সঠিকভাবে আমদানি করছে কি না এবং বছর শেষে আমদানিকৃত মালের হিসাব প্রদান করছে কি না ইত্যাদি বিষয় ঠিকমতো যাচাই-বাছাই না করে সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকেন। আবার ব্লকলিস্ট অনুমোদনে কমিটির কিছু সদস্যের সাথে কোম্পানিগুলোর যোগসাজশ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্লকলিস্টের অনুমোদন প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এ সুযোগে আমদানিকারকরা অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানি করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কিছু আমদানিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত কাঁচামাল বাইরে খোলাবাজারে বিক্রি করে থাকেন। ব্লকলিস্টের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল শুধু আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত বিল অব এন্ট্রির তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ প্রশাসন তাদের তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং ছাড়পত্র প্রদান করে। কিন্তু আমদানিকৃত কাঁচামালের গুণগত মানের তদারকি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কোনোরকম ভূমিকা পালন করে না।

৪.৬ ওষুধের লিটারেচার অনুমোদন

ওষুধের লিটারেচার অনুমোদনে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষণীয়। কিছু কোম্পানি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের লিটারেচারে অতিরিক্ত বিভিন্ন উপাদান বা উপকারের কথা উল্লেখ করে থাকে, যা ওই ওষুধের জন্য প্রযোজ্য বা সামঞ্জস্য নয়। তথাপি ওষুধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এ ধরনের লিটারেচার অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো কোম্পানি ওষুধ প্রশাসন থেকে লিটারেচারের অনুমোদন না নিয়েই ওষুধ বাজারজাত করে থাকে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে তা জানলেও অবৈধ অর্থের লেনদেনের কারণে তা এড়িয়ে যান।

৪.৭ ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও নমুনা পরীক্ষা

ওষুধের নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। ওষুধ কোম্পানিগুলোর বাজারজাতকৃত ওষুধ থেকে ব্যাচ অনুযায়ী দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে ওষুধ পরীক্ষাগারে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ওষুধের মান পরীক্ষা না করে সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওষুধের ছাড়পত্র প্রদান করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু ছোট ও স্থানীয় ওষুধ কোম্পানির নিজস্ব পরীক্ষাগারে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা না থাকায় তাদের উৎপাদিত ওষুধের মান পরীক্ষা অধিদপ্তরের পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল, যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থার অভাব থাকার কারণে এক শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারী অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সাথে যোগসাজশে ওষুধের মান পরীক্ষায় মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন। ওষুধ উৎপাদনের পর তার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ঔষধ প্রশাসন থেকে নিয়মিতভাবে তদারকির অভাব লক্ষণীয়। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বেশির ভাগ কোম্পানিরই, বিশেষ করে ছোট কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত ওষুধ ও এর কাঁচামাল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। ছোট কোম্পানিগুলোর এ ধরনের অনিয়ম ঔষধ প্রশাসন থেকে নিয়মিত তদারকি করা হয় না। তা ছাড়া ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের এ ধরনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম ঢাকার জন্য সংশ্লিষ্ট ঔষধ তত্ত্বাবধায়ককে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইনানুযায়ী ওষুধে ব্যবহৃত উপাদান অবশ্যই ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অথবা ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল কোডেক্স অথবা ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়ার যেকোনো প্রবন্ধে উল্লেখ থাকতে হবে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না অথচ ওষুধের ফয়েলে ওষুধের মান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বিপি, ইউএসপি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এসব বিষয়ে ছাড়পত্র দেওয়ার আগে সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না; যা এ অনিয়মকে সাধারণ বাস্তবতায় পরিণত করেছে।

৪.৮ ওষুধের মূল্য নির্ধারণ

ওষুধের মূল্য নির্ধারণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ক্ষমতা মূলত কাগজে-কলমে বিদ্যমান। ওষুধ কোম্পানিগুলোই মূলত তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর শুধু ১১৭টি অত্যাবশকীয় ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে; যদিও এর মধ্যে অনেক ওষুধই বর্তমানে উৎপাদিত হয় না। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০১ সালের আগে ওষুধের মূল্য নির্ধারণে

ঔষধ প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ঔষধ প্রশাসন নামমাত্র ভূমিকা পালন করে এবং কোম্পানিগুলো নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে এবং ওষুধের মূল্য নির্ধারণ কমিটির মাধ্যমে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদিত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করে ঔষধ প্রশাসনে নিবন্ধনের জন্য জমা দেয় এবং ঔষধ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শুধু নিয়মানুযায়ী ভ্যাট সংযোগ করে মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে তা পর্যালোচনার জন্য জমা দেন। আমদানিকৃত ওষুধের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসন ও আমদানিকারকদের মধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমদানিকারকদের মধ্যে কেউ কেউ ওষুধ প্রশাসনের মূল্য নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ফলে ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা থাকে এবং কমিটির অন্য সদস্যদের আমদানিকারক দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়। এ ছাড়া আমদানিকারকরা ঔষধ প্রশাসনে আমদানিকৃত ওষুধের ক্রয়মূল্য দাখিল করার সময় সংশ্লিষ্ট বিদেশি কোম্পানির সাথে যোগসাজশে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দেখিয়ে থাকে। ঔষধ প্রশাসন থেকে ঠিকমতো তদারকি না করা এবং তদারকির ক্ষেত্রে অদক্ষতার কারণে বেশি মূল্য দেখিয়ে অনেক সময় মূল্য অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

৪.৯ গুড ম্যানুফেকচারিং প্র্যাকটিস (জিএমপি) সনদ

ওষুধ কোম্পানিগুলোর গুড ম্যানুফেকচারিং প্র্যাকটিস অনুসরণের বিষয়টি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে পরিবীক্ষণ সাপেক্ষে সনদ প্রদান করা হয়। ঔষধ প্রশাসন থেকে কোম্পানিগুলোকে এ বিষয়ে একটি গাইডলাইন সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলোকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অধিদপ্তর থেকে এ গাইডলাইন সরবরাহ করা হয় না। আবার দেখা যায় ঔষধ প্রশাসন থেকে এসব তথ্য অনুসরণ করার কথা বলা হলেও বেশ কিছু কোম্পানি বেশি মুনাফা লাভের আশায় তা অনুসরণ করে না। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ ক্ষেত্রে তাদের তদারকির দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কোম্পানি পরিদর্শন না করে অথবা পরিদর্শনকালীন নানা ধরনের অনিয়ম পাওয়া সত্ত্বেও জিএমপি সনদ প্রদান করেন। বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে জিএমপি সনদ প্রদানে ঔষধ প্রশাসনের দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও রাজনৈতিক চাপ উল্লেখ করা হয়।

৪.১০ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি)

সাধারণত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বা গবেষণা কাজে বিদেশি ওষুধ ও ওষুধ দ্রব্যাদি স্বল্প পরিমাণে আমদানির ক্ষেত্রে এনওসির নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ নিয়ম লঙ্ঘন করে ঔষধ প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানি করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এনওসি অনুমোদন ঔষধ প্রশাসনের কিছু প্রভাবশালী কর্মকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা লক্ষণীয়।

৪.১১ ড্রাগ লাইসেন্স (খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান)

ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুকরণে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। বর্তমানে সারা দেশে এক লাখ ১২ হাজার ২১৮টি খুচরা ও পাইকারি ওষুধের দোকান রয়েছে। ড্রাগ

লাইসেন্স আবেদনে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অথবা ড্রাগ স্টোরের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির অবশ্যই 'সি গ্রেড'-এর ফার্মেসি কোর্সের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এই হিসাবে সারা দেশে সি গ্রেডের ফার্মাসিস্টের সংখ্যা ও দোকানের সংখ্যা সমপরিমাণ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে রেজিস্ট্রেশনধারী সি গ্রেডের ফার্মাসিস্টের সংখ্যা হচ্ছে ৬৯ হাজার ৬৪৮ (১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের তথ্য)। ২০০১-২০০৪ সালে ঔষধ প্রশাসন থেকে সারা দেশে প্রায় ২৫-৩০ হাজার নতুন ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উল্লিখিত বছরগুলোতে মূলত একই ফার্মাসিস্টের রেজিস্ট্রেশন দুই-তিনবার দেখিয়ে এবং এক জেলার ফার্মাসিস্টের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে অন্যান্য জেলায় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নতুন ড্রাগ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হলে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার ঔষধ তত্ত্বাবধায়ককে সংশ্লিষ্ট দোকান পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যাচাই করে জেলা ড্রাগ লাইসেন্স কমিটিতে উপস্থাপন করতে হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করেই দোকানদারের সাথে যোগসাজশে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে নির্ধারিত ফি ছাড়াও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

ওষুধের দোকান পরিবীক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক ও ওষুধের দোকানদারদের মধ্যে দুর্নীতির যোগসাজশ লক্ষণীয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ওষুধের দোকান পরিবীক্ষণ ও তদারকিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করে ওষুধের দোকান থেকে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে নিয়মাবলি ও শর্ত শিথিল করে থাকে। মূলত এ অনিয়মের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতি কাজ করে থাকে।

৫. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের তদারকির ঘাটতি ও ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুষ্ঠু তদারকির ঘাটতির কারণে কিছু ওষুধ কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ লক্ষণীয়। কিছু ওষুধ কোম্পানি দেশে ও বিদেশে ওষুধ বিপণনে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম ও গুণগত মানের ভিন্নতার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদেশে রপ্তানিতে তারা উন্নতমানের কাঁচামালের ব্যবহার ও স্থানীয় বাজারে বিপণনের জন্য নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে। আবার কিছু কোম্পানি কর্তৃক ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ বিচ্ছিন্ন করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে ওষুধ তৈরিতে বিভিন্ন ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ না করা সত্ত্বেও ওষুধের ফয়েলে বিপি, ইউএসপি উল্লেখ করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে, বিশেষত ব্লকলিস্ট অনুমোদন কমিটি এবং মূল্য নির্ধারণ কমিটিতে কিছু প্রভাবশালী কোম্পানির সদস্য কর্তৃক নিজ কোম্পানিসহ অন্য কোম্পানির ওষুধের ব্লকলিস্ট অনুমোদনে প্রভাব বিস্তার এবং মূল্য নির্ধারণে কিছু ওষুধ কোম্পানির মালিকদের শক্তিশালী ভূমিকা এবং অনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। ফলে দেখা যায় কিছু কোম্পানি জোটবদ্ধ হয়ে কিছু সংখক ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আইন অনুযায়ী ওষুধের মোড়কে উৎপাদন কারখানার নাম ও অবস্থান উল্লেখ করার বিধান থাকলেও কিছু দেশি ও বিদেশি কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষেত্রবিশেষে তা উল্লেখ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার কিছু ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ওষুধের রেজিস্ট্রেশন ও মূল্য অনুমোদনের আগেই বাজারজাত করার অভিযোগ রয়েছে।

সারনি-: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমান

সেবার ধরন	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ (টাকা)
নতুন লাইসেন্স প্রদান (অ্যালোপ্যাথিক)	৫ -১০ লাখ
লাইসেন্স নবায়ন	৫০ হাজার-১ লাখ
প্রকল্প হস্তান্তর বা স্থানান্তর	১০ - ১৫ লাখ
রেসিপি অনুমোদন	৪ - ৫ হাজার (রেসিপি প্রতি)
ওষুধ নিবন্ধন	১ - ১.৫ লাখ
ফয়েল, ইনসার্ট, লেবেল অনুমোদন	৭ - ৯ হাজার (খসড়া ও চূড়ান্ত)
ব্লকলিস্ট অনুমোদন	২ - ২.৫ হাজার (পেজ প্রতি)
লিটারেচার অনুমোদন	৪ - ৫ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
মূল্য নির্ধারণ	৫ - ৬ হাজার (প্রডাক্ট প্রতি)
ওষুধ রপ্তানির নিবন্ধন ও জিএমপি সনদ	২০ - ৩০ হাজার (উভয় ক্ষেত্রে)
নমুনা পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ	৬ - ৭ হাজার (নমুনা প্রতি)
ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	১০ - ১৫ হাজার
ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন	৫০০ - ১ হাজার (নবায়ন)

৬. উপসংহার

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর তার কাজের পরিধি, ভৌগোলিক আওতা ও ওষুধের বাজারের বিস্তৃতি বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্ষম নয়। ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, যেমন– জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং দক্ষতা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ ছাড়া ওষুধের বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনি কাঠামো সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট নয় এবং বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাব রয়েছে। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন না করা, কর্মবণ্টনে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষণীয়। ওষুধ প্রশাসনের সেবা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে মূলত সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এবং স্থানীয় ছোট কোম্পানিগুলো অধিক মাত্রায় সমঝোতামূলক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে। অপরদিকে ঔষধ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রভাব সমঝোতামূলক দুর্নীতিকে শক্তিশালী করছে। সার্বিকভাবে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চাহিদা অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি না করা, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সুবিধা ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ না বাড়ানো, ওষুধ নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইনি সংস্কার না করা উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

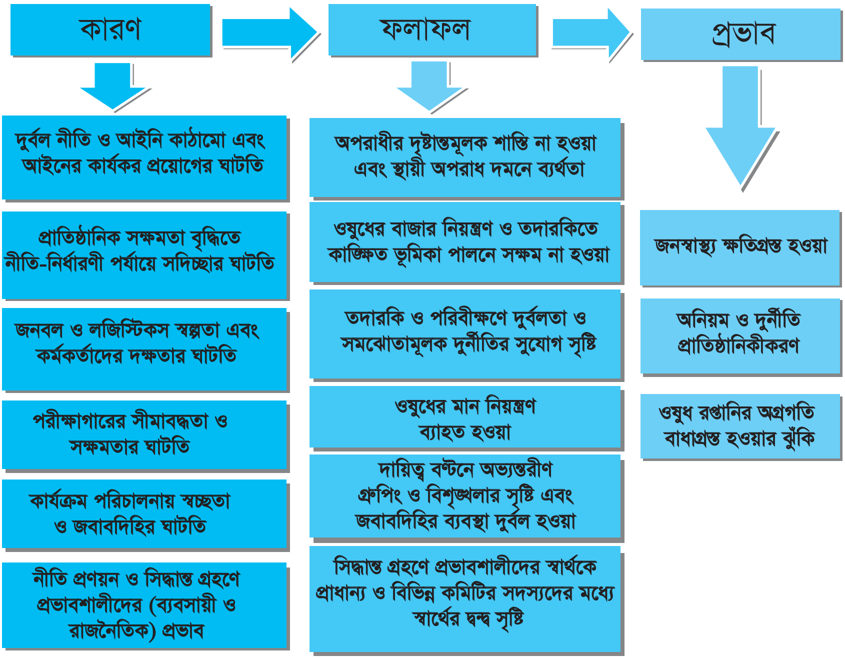

৭. সুপারিশ

এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও টেকসইকরণ এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করছে-

৭.১ আইন ও নীতি-সংক্রান্ত

১. একটি যুগোপযোগী নীতিকাঠামো তৈরি এবং ওষুধ আইন ১৯৪০ ও ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় এনে একটি সমন্বিত একক আইন প্রণয়ন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে হবে

- আইনে মেডিকেল ডিভাইস, ফুড সাপ্লিমেন্ট ও কসমেটিকস সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা।
- ওষুধ-সংক্রান্ত কমিটিগুলোর গঠন ও কর্মপ্রক্রিয়া আইনে অন্তর্ভুক্ত ও সুনির্দিষ্ট করা।
- ওষুধের মূল্য নির্ধারণে গেজেট প্রকাশের সময়কাল সুনির্দিষ্ট করা।
- ওষুধ আইনে অপরাধের জরিমানা ও শাস্তির অসামঞ্জস্যতা দূর করে কঠোর দন্ডের ব্যবস্থা করা।

৭.২ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত

২. কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি ওষুধ পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি ও অতিসত্বর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সব পর্যায়ে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

৩. প্রতিটি জেলায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-আসবাব, কারিগরি সুবিধা ও পরিদর্শনে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. চাহিদা নিরূপণ করে কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. অর্গানোগ্রাম ও কর্মবিবরণ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করতে হবে এবং ওষুধ কারখানা পরিবীক্ষণের দায়িত্ব বণ্টনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. অনলাইনভিত্তিক রিপোর্টিং চালু করতে হবে।

৭. ওয়েবসাইটে সব ধরনের রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৮. ওষুধ কোম্পানিগুলোর ওয়ানস্টপ ও অনলাইনভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু করতে হবে।

৯. ওষুধ প্রশাসনের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা–এ লক্ষ্যে টোল ফ্রি নম্বর বা হটলাইন চালু করতে হবে।

৭.৩ অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ-সংক্রান্ত

১০. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১. ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে, বিশেষ করে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কমিটি, মূল্য নির্ধারণ কমিটি, ব্লকলিস্ট অনুমোদন কমিটি ও প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করতে হবে।

১২. যেসব ওষুধ কোম্পানি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করে, সেগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প : ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মোহাম্মদ হোসেন, মো. রবিউল ইসলাম

১. ভূমিকা

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার ৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান ২০১০' অনুসারে সরকার দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ-সুবিধার আওতায় আনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, যেমন- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণকে উৎসাহিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় ও বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কয়লার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আটটি বড় ও ১০টি ছোট আকারের কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে জাতীয় বরাদ্দ ক্রমেই বাড়ছে; চলমান অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য ১১ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে; যা মোট জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। কয়লানির্ভর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে বাগেরহাট জেলার রামপালে প্রথম বৃহদাকার কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অগ্রগতির দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। এখানে উল্লেখ্য, জাপান সরকার প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল থেকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য ঋণ প্রদান করেছে বলে জানা যায়।

যেকোনো ধরনের অবকাঠামো স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে জমি অধিগ্রহণ একটি জটিল বিষয়। উপরিউক্ত প্রকল্পগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে

---

* ২০১৫ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকায় টিআইবির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

সারণি ১ : রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের সাধারণ তথ্য

বিবরণ	রামপাল	মাতারবাড়ি
উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	১৩২০	১৩২০
জমি অধিগ্রহণ (একর)	১৮৩৪	১৪১৪
বাজেট (প্রায়)	১৪ হাজার ৫১০ কোটি টাকা	৩৬ হাজার কোটি টাকা
ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ	৬২ কোটি ৫০ লাখ টাকা	২৩৭ কোটি টাকা
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কো. লি.	সিপিজিসিবিএল
আর্থিক বিনিয়োগ	৩০ শতাংশ ভারত-বাংলাদেশ সমান অংশীদারিত্ব, ৭০ শতাংশ ঋণ	জাইকা (ঋণ), সিপিজিসিবিএল, বাংলাদেশ সরকার
প্রযুক্তি	সুপার - ক্রিটিক্যাল	আল্ট্রা - সুপার - ক্রিটিক্যাল
উৎপাদন শুরুর বছর	জুন ২০১৯	জুন ২০২১
ইআইএ সম্পাদন	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস	টোকিও ইলেকট্রিক সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেড
স্থান	সাপমারি, রামপাল, বাগেরহাট	মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি সর্বাধিক মনোযোগ না পাওয়া নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। রামপাল প্রকল্পটি সুন্দরবনের নিকটবর্তী হওয়ায় পরিবেশের ঝুঁকির বিষয়ে এই প্রকল্প ঘিরে বিভিন্ন পক্ষ উদ্বেগ জানিয়ে আসছে। এসব প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার যথার্থতা নিয়েও পরিবেশবাদীদের আপত্তি আছে। এরই প্রেক্ষাপটে রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া তথা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া ও জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা এবং এর প্রয়োগ পর্যালোচনা করা;

২. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা;
৩. জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন অনুসন্ধান করা; এবং
৪. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

উল্লেখ্য, গবেষণায় রামপাল ও মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং জমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রেরণ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণগুলো অন্তর্ভুক্ত।

১.৩. গবেষণাপদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা; যেখানে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেমন– নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনের গাইডলাইন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, জমি অধিগ্রহণ-সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা, বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ। এই গবেষণা কার্যক্রম নভেম্বর ২০১৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫-এর মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১. রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার 'লাল' তালিকাভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করতে হয়। ইআইএ গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসারে তিনটি ধাপের মাধ্যমে ইআইএ সম্পাদন করা হয়– (১) স্ক্রিনিং (যাচাই-বাছাই), (২) প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং (৩) পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা। ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের জন্য বিকল্প স্থান নির্বাচন, প্রকল্প কার্যাবলি, পরিবেশ ও আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এ দুটি প্রকল্পের জন্য সম্পাদিত ইআইএর সম্পাদন প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়।

২.১.১. ইআইএ সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সংঘাত

আন্তর্জাতিকভাবে ইআইএ নির্মোহভাবে সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও রামপালে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ইআইএ আরেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান (সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস– সিআইজিআইএস) এবং জাপানি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ অন্য আরেকটি জাপানি কোম্পানি (টোকিও ইলেকট্রিক সার্ভিসেস কো. লিমিটেড) কর্তৃক সম্পাদনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকার আশঙ্কা থাকায় এটি নিরপেক্ষতার মানদণ্ড অর্জন করতে পারেনি বলে তথ্যদাতারা মত প্রকাশ করেন।

২.১.২. *পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মবহির্ভূত অনুমোদন*

আইন অনুযায়ী শিল্প এলাকা বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা ছাড়া এ ধরনের প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ার নিয়ম নেই। রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সপক্ষে অবস্থান ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল (রিজার্ভ ফরেস্ট), যার আইনগত অভিভাবক (Legal Custodian) বন বিভাগ। কিন্তু এই প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বন বিভাগের মতামত গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পটি যে স্থানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সেটিও শিল্প এলাকা, শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা নয়। মাতারবাড়ি এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৬ হাজার ৬৬৭ জন মানুষের বসবাস।

২.১.৩. *অবস্থান ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্ত ভঙ্গ*

রামপাল প্রকল্পে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই) প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অবস্থান ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল কতগুলো শর্তের ভিত্তিতে এবং এসব শর্তের যে কোনোটি ভঙ্গ করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। রামপাল প্রকল্পে এসব শর্ত ভঙ্গ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই মাটি ভরাট করাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করা হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

২.১.৪. *জন-অংশগ্রহণ যথাযথভাবে নিশ্চিত না করা*

রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণে সিইজিআইএসের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পের ইআইএ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম রক্ষার জন্য গণশুনানি করা হয়েছে, যেখানে পরিবেশবাদীসহ নানা পক্ষ এই প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক তুলে ধরলেও সেগুলো অগ্রাহ্য করে ইআইএ চূড়ান্ত করা হয়। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা 'প্রকল্পের বিরোধিতা করলে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে' বলে হুমকি দেন। এই হুমকি নিয়েই স্থানীয় জনগোষ্ঠী মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে, যেগুলো করা হয়েছে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে।

অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএ সম্পাদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের 'টার্মস অব রেফারেন্সে' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শুনানি করার কথা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ের কোনো মতবিনিময়ের তথ্য ইআইএ প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। ইআইএ-তে উল্লিখিত দুটি মতবিনিময়

সভার একটিও প্রকল্প এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। ইআইএ প্রতিবেদনে যে সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করা হয়েছে, সেখানে সব অংশগ্রহণকারীর মতামত অন্তর্ভুক্ত না করারও অভিযোগ রয়েছে। মতবিনিময় সভাগুলোতে প্রকল্পের বিষয়ে, বিশেষ করে প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়নি। সার্বিকভাবে দুটি প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের কারণে পরিবেশগত এবং মানুষের আর্থসামাজিক ঝুঁকির বিষয়ে স্থানীয় জনগণ যে বিভিন্নভাবে এসব প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান প্রকাশ করেছে, তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

২.১.৫. *প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে পরিবেশ ও মানুষের আর্থসামাজিক ঝুঁকি বিবেচনায় না নেওয়া*

রামপাল প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষায় বিকল্প স্থান হিসেবে খুলনার লবণচড়ার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও কেবলমাত্র মংলা বন্দরের সাথে নৌ-যোগাযোগ ও প্রস্তাবিত খুলনা-মংলা রেললাইনের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনায় রামপালকেই চূড়ান্ত স্থান হিসেবে মনোনীত করা হয়। অন্যদিকে মাতারবাড়িকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত দুটি স্থানের (হোয়ানক ও মাতারবাড়ি) আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব একই ধরনের হলেও প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে মাতারবাড়িকে সুবিধাজনক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুটি ক্ষেত্রেই পরিবেশগত বা মানুষের আর্থসামাজিক ঝুঁকির চেয়ে প্রকল্পের খরচ এবং অন্যান্য সুবিধাকে প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.১.৬. *পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা*

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ফলে পরিবেশদূষণ হওয়ার কারণে কোনো দেশেই সংরক্ষিত বনভূমি, জাতীয় উদ্যান ও জনবসতির বহিঃসীমা থেকে ১৫-২৫ কিলোমিটারের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় না। ভারতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদন করা হয় না। কিন্তু রামপালের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সুন্দরবনের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা থেকে ১৪ কিলোমিটার এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পটি সোনাদিয়া পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এবং দুটি প্রকল্পই জনবসতির কাছাকাছি।

২.১.৭. *প্রকল্পের ছাই ব্যবস্থাপনায় এর দূষণ বিবেচনা না করা*

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে বছরে সাত লাখ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও দুই লাখ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হবে, যা ব্যবহৃত কয়লার ১৫ শতাংশ। উৎপাদিত ছাইয়ের পরিমাণ বছরে ৭ লাখ ১১ হাজার ৭৫০ মে.টন, যা দিয়ে প্রকল্পের মোট এক হাজার ৮৩৪ একর জমির মধ্যে এক হাজার ৪১৪ একর ভরাট করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে প্রকল্পে ২০ শতাংশ ছাই উৎপন্ন হবে। প্রকল্পে ১৮৩ একর জায়গাজুড়ে ছাইয়ের পুকুর তৈরি করা হবে। তথ্যদাতাদের মতে, যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে উড়ন্ত ছাই পরিবেশের দূষণ ঘটাবে, যা ইআইএ প্রতিবেদনে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়নি। এ ছাড়া সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পুকুরে জমা বর্জ্য ছাইয়ের বিষাক্ত ভারী ধাতু নিশ্চিতভাবেই বৃষ্টির পানির সাথে মিশে ও চুঁইয়ে প্রকল্প

এলাকার মাটি ও মাটির নিচের পানির স্তরকে দূষিত করবে, যার প্রভাব শুধু প্রকল্প এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

২.১.৮. *সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে কয়লা পরিবহনের ফলে সৃষ্ট দূষণ বিবেচনা না করা*

ইআইএ অনুযায়ী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাজার টন কয়লা সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে পরিবহনের ফলে সুন্দরবন ও এই বনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর কী ক্ষতি হবে সমীক্ষায় তা বলা হয়নি। রাতে জাহাজ চলাচল ও মালামালা খালাসের ফলে সৃষ্ট শব্দ ও আলোর দূষণে সুন্দরবনে যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে তা-ও ইআইএ প্রতিবেদনে বিবেচনায় রাখা হয়নি।

২.১.৯. *পানি প্রত্যাহার এবং পুনর্নির্গমনের প্রভাব মূল্যায়ন না করা*

রামপালে প্রকল্প পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে পশুর নদ থেকে ঘণ্টায় ৯ হাজার ১৫০ ঘনমিটার পানি সংগ্রহ করা হবে, যেটিকে নদীর মোট পানি প্রবাহের ১ শতাংশেরও কম বলে দেখানো হয়েছে। পরিশোধন করার পর পানি পশুর নদে ঘণ্টায় ৫ হাজার ১৫০ ঘনমিটার হারে নির্গমন করা হবে। ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে পশুর নদ থেকে পানি প্রত্যাহার এবং পুনরায় তা নদে ফেরত দেওয়ার ফলে পশুর নদের পানি প্রবাহের ওপর কী প্রভাব ফেলবে তার গভীর পর্যালোচনা ছাড়া শুধু 'নদের হাইড্রোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন না-ও হতে পারে' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, প্রত্যাহার করা পানির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম দেখানোর জন্য পানি প্রবাহের যে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তা সাম্প্রতিক সময়ের নয় (২০০৫ সালের তথ্য)। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পানি নির্গমনের কারণে 'শূন্য নির্গমন' বা 'জিরো ডিসচার্জ' নীতি অবলম্বন করার কথা থাকলেও রামপাল কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। তথ্যদাতাদের মতে, পরিশোধন করা হলেও পানির তাপমাত্রা, পানি নির্গমনের গতি, দ্রবীভূত নানা উপাদান পশুর নদ, সমগ্র সুন্দরবন তথা বঙ্গোপসাগরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২.১.১০. *বাস্তবায়ন অযোগ্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা*

উভয় ইআইএ প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ প্রকল্পে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। এ কারণে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ নেই। গবেষণার সময়কালে প্রকল্পগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাউকেই কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

২.১.১১. *পর্যাপ্ত তথ্য উপস্থাপন না করা, তথ্য গোপন করা ও ভুল তথ্য দেওয়া*

ইআইএ প্রতিবেদনে উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসেনি। এ ছাড়া নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়নি, তথ্য গোপন করা হয়েছে বা ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ক. বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের তথ্য গোপন : ২০১০ সালের প্রজ্ঞাপনমূলে সরকার সুন্দরবনের পূর্ব বন বিভাগের আওতাধীন পশুর নদকে 'বিরল প্রজাতির গাঙ্গেয় ডলফিন ও ইরাবতী ডলফিন' সংরক্ষণের

স্বার্থে ‘বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য’ ঘোষণা করে। কিন্তু রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন করা হয়েছে এবং পশুর নদ, সুন্দরবনের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব নিয়ে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। ইআইএ প্রতিবেদনে বায়ু প্রবাহের বিষয়েও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেওয়া হয়েছে। উভয় প্রকল্পের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উঠে আসেনি। এ ছাড়া প্রকল্প থেকে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমন হবে তার ফলে সুন্দরবনের পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্প এলাকায় কোন কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তার কোনো তালিকা দেওয়া হয়নি। প্রকল্পের ফলে এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে কি না, তাও উল্লেখ করা হয়নি।

খ. ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার বা এফজিডি (FGD) ব্যবহারে অস্পষ্টতা : রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়লায় সালফারের পরিমাণ শূন্য দশমিক ৬ শতাংশের চেয়ে বেশি হলে এফজিডি ব্যবহার করা হবে। অথচ পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি স্থাপনের খরচ দেখানো হয়েছে, সেখানে এফজিডির কথা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে আদৌ এই প্রকল্পে এফজিডি ব্যবহার করা হবে কি না, সেটি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। তথ্যদাতাদের মতে, খরচের বিবেচনায় প্রকল্পগুলোতে এফজিডি ব্যবহার না করার আশঙ্কা বেশি।

গ. সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নিরাপদ মাত্রা দেখানো

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী (তফসিল ২) সংবেদনশীল এলাকায় সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০ মা.গ্রা/ঘ.মি. এবং আবাসিক এলাকায় ৮০ মা.গ্রা/ঘ.মি.। তথ্যদাতাদের মতে, রামপালের ইআইএ প্রতিবেদনে প্রকল্পের ফলে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ বিভিন্ন কৌশলে বিধিমালার নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে দেখানো হয়েছে। যেমন :

১. সুন্দরবন এলাকাকে ‘আবাসিক’ ও ‘গ্রাম্য’ এলাকা হিসেবে দেখানো : সংশোধনের আগের ইআইএ প্রতিবেদনে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে থেকে নির্গত সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের ২৪ ঘণ্টার ঘনত্ব সুন্দরবন এলাকায় যথাক্রমে ৫৩ দশমিক ৪ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ৫১ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার দেখানো হয়, যা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর এলাকার মানদণ্ডের চেয়ে (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার) অনেক বেশি। সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের এই মাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য আগের ইআইএ প্রতিবেদনে সুন্দরবনকে ‘আবাসিক’ ও ‘গ্রাম্য এলাকা’ হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

২. সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ দৈনিক হিসাবের পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবে দেখানো : রামপালের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদনে সালফার-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন-অক্সাইড গ্যাসের নির্গমনের ২৪ ঘণ্টার মাত্রা দেখানো হয়েছে যথাক্রমে ৫৮ দশমিক ৪৩ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ৪৭ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার, যা ১৯৯৭ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা

অনুযায়ী নিরাপদ সীমার মধ্যে পড়ে না (৩০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার)। প্রতিবেদনে সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাসের নির্গমনের পরিমাণ নিরাপদ সীমার মধ্যে দেখানোর জন্য দৈনিক হিসাবে দেখানোর পরিবর্তে বার্ষিক হিসাবে দেখানো হয়, যা যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৩৬ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার ও ২৩ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার। অথচ এর আগের ইআইএ প্রতিবেদনে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার স্ট্যান্ডার্ডকে ২৪ ঘণ্টার গড় হিসাবে দেখানো হয়েছিল। মাতারবাড়ি প্রকল্পের ইআইএতে প্রকল্পের ফলে সালফার-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণের ক্ষেত্রে কেবল সালফার-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ৮২০ মাইক্রোগ্রাম/ এনএম৩ এবং নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড পরিমাণ ৪৬০ মাইক্রোগ্রাম/ এনএম৩-এর নিচে রাখা হবে বলা হলেও এসব গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ কত হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

৩. সালফার, নাইট্রোজেন নিঃসরণ প্রতি সেকেন্ডে দেখানো : রামপাল প্রকল্পে সালফার নিঃসরণের পরিমাণ একটা ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ৮১৯ গ্রাম সালফার-ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করবে বলে দেখানো হয়েছে। এভাবে প্রতি ইউনিট বা সেকেন্ড হিসেবে দেখিয়ে পরিমাণটাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত হিসাব হলো দুটি ইউনিট থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৮১৯ গ্রাম সালফার-ডাই-অক্সাইড ডিসচার্জ করা হলে ২৪ ঘণ্টায় তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪২ মে.টন, এক মাসে চার হাজার ২৬০ মে.টন এবং এক বছরে ৫১ হাজার ৪৩০ মে.টন, যা একটি বিশাল পরিমাণ। এভাবে প্রতিটি বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের হার কম দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

২.২. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া

সুন্দরবনের কাছে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরোধিতা করে সাধারণ জনগণসহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন– মানববন্ধন, প্রবন্ধ লেখা, স্মারকলিপি ও আদালতে রিট আবেদন দাখিল করেছে। সুন্দরবনের কাছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইতিমধ্যে রামসার কর্তৃপক্ষ এবং ইউনেসকো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এই প্রকল্প নির্মাণের অংশীদার হওয়ার কারণে নরওয়ের এথিক্যাল গ্রুপ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে নরওয়েজিয়ান সরকারকে তাদের Government Pension Fund Global (GPFG) থেকে এনটিপিসির অন্তর্ভুক্তি বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেছে। প্রকল্পগুলো নির্মাণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল দাবির যৌক্তিকতাকে দুর্বল করেছে বলে মতপ্রকাশ করেন তথ্যদাতারা। এ ছাড়া তথ্যদাতারা রামপাল প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সম্পাদিত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তিটিকে জাতীয় স্বার্থবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। দুটি প্রকল্পেরই ব্যয়-লাভের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ঝুঁকির দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়নি বলে তারা মন্তব্য করেন। অন্যদিকে সুন্দরবনের কারণে রামপালের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গণমাধ্যমে প্রচার পেলেও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই তেমন কিছু জানেন না বলে উল্লেখ করেন। তথ্যদাতাদের মতে, মাতারবাড়ি প্রকল্প এলাকাটির পাশে সুন্দরবনের মতো কোনো স্পর্শকাতর ইস্যু না থাকার কারণে পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্প নিয়ে মনোযোগী নন।

২.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৩.১ *জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা*

বাংলাদেশ সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের দুর্বলতা

বাংলাদেশ সরকারের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২-এ জমি অধিগ্রহণের ফলে জমির মালিক ছাড়া ওই জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষের ক্ষতিপূরণের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে অধিগ্রহণকৃত জমির ওপর নির্ভরশীল স্বত্বাধিকারহীন মানুষের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি আইনগতভাবে স্বীকৃতি পায়নি, যা আন্তর্জাতিক অধিগ্রহণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক।

বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কারণে জনগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

সরকারি নীতিমালা অনুসারে গত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য অনুসারে ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ করার ফলে জমির মালিকরা প্রকৃত বাজারমূল্য থেকে কম ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন। সাধারণত মানুষ জমি ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখায়। এ কারণে সরকার গত ১২ মাসের গড় বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করায় প্রকৃত বাজারমূল্যের চেয়ে ক্ষতিপূরণ মূল্য কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২ : জমির প্রকৃত বিক্রয়মূল্য ও ক্ষতিপূরণ মূল্য

মৌজা	জমির ধরন	ক্ষতিপূরণ মূল্য (৫০শতাংশ প্রিমিয়ামসহ)	প্রকৃত বাজার মূল্য
ধলঘাটা (৪০ শতাংশ)	লবণ	২.৫ লাখ টাকা	৫ - ৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	৩.৫ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
মাতারবাড়ি (৪০ শতাংশ)	লবণ	৪.৫ লাখ টাকা	৫ - ৬ লাখ টাকা
	নাল/কৃষি	১০ - ১২ লাখ টাকা	১২ লাখ টাকা
রামপাল (১০০ শতাংশ)	কৃষি/চিংড়ি	২ লাখ ৭০ হাজার টাকা	৫ - ৬ লাখ টাকা

ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া

ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ফাইল প্রস্তত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে বিভিন্ন রকম জটিলতায় পড়তে হয়। এ ছাড়া যথাযথ ফাইল প্রস্তত করে জমা দেওয়ার পর ক্ষতিপূরণ পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

২.৩.২ *জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি*

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

দুটি প্রকল্পেই ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শুরুতে সাধারণ মানুষকে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিষয়ে কোনো কিছু জানানো হয়নি। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি তারা প্রথম জানতে পারে ৩ ধারার নোটিশ আসার পর। মাতারবাড়ি প্রকল্পের মতবিনিময় সভাগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যে কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিল, সভার কার্যবিবরণীতে তাদের মতামত

উঠে আসেনি। অন্যদিকে রামপাল প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদনে বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের সাথে সর্বমোট ১০টি মতবিনিময় সভার কথা বলা হলেও এই সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারী মানুষ প্রকল্পের বিরোধিতা না করার ব্যাপারে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার হুমকির মুখে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল।

উপরন্তু দেখা যায়, দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই প্রকল্পের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করাসহ বিভিন্ন প্রকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান করেছে। যারা রামপাল প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রকল্পের বিরোধিতার জন্য মামলা না দিলেও অন্যান্য ইস্যুতে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বর্তমানে অনেকে পুলিশের ভয়ে পলাতক জীবন যাপন করছেন। এ ছাড়া অনেককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করার তথ্যও পাওয়া গেছে।

জনগণের আপত্তি নিষ্পত্তি না করা

প্রকল্প দুটির শুরু থেকেই স্থানীয় জনগণ তাদের জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করে আসছে। ৩ ধারা নোটিশ জারির পর বিভিন্ন উপায়ে স্থানীয় জনগণ তাদের আপত্তি জানায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনগণের এসব আপত্তি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেনি।

নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করেই জমি অধিগ্রহণ

দুটি প্রকল্পেই স্থান চূড়ান্তকরণ ও জমি অধিগ্রহণের পর পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়েছে, বিশেষ করে রামপাল প্রকল্পের সাইটক্লিয়ারেন্স পাওয়ার আগেই ভূমি অধিগ্রহণ এবং বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদনের জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্স'-এর অনুমোদনের পাঁচ দিনের মধ্যে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। অন্যদিকে ইআইএ সম্পাদনে প্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 'টার্মস অফ রেফারেন্স' অনুমোদনের আগেই। তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পগুলো এসব এলাকায় স্থাপন করা হবে- এটা ধরে নিয়েই বাকি কার্যাবলি নিয়ম রক্ষার্থে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ পরিশোধের আগেই জমির দখল গ্রহণ

দুটি প্রকল্পেই জনগণের মাঝে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৬ ও ৭ ধারা নোটিশ না দিয়েই জমি ও ঘেরমালিকদের জমি ও ঘের থেকে উচ্ছেদ করে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে ওই জমি বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও পুলিশ ব্যবহার করে জনগণকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

রিট আবেদনের নিষ্পত্তি ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু

কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দুটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে একাধিক রিট আবেদন করা হয়েছে। প্রাথমিক শুনানি শেষে 'কেন কয়লা প্রকল্পটি বাতিল হবে না' এই মর্মে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বরাবর একটি রুল জারি করেন হাইকোর্ট। কিন্তু রুল ও দায়ের করা এসব রিটের নিষ্পত্তি না করেই বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উন্নয়নকাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

আরবিট্রেশন-সংক্রান্ত হয়রানি

কোনো ক্ষতিপূরণের ফাইলের বিপরীতে আরবিট্রেশন থাকলে সেটা সমাধানের জন্য আইনজীবী নিয়োগ, নির্ধারিত তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট না বসার ফলে বারবার তারিখ বদলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের হয়রানির শিকার হতে হয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা জমির মালিকানা-সংক্রান্ত জটিলতা থাকলে ক্ষতিপূরণের ফাইলে হয়রানিমূলক আরবিট্রেশন দেওয়া হয়। এ ছাড়া ডিসি অফিসের কিছু কর্মচারী অনেক ক্ষতিপূরণ ফাইলে প্রতারণামূলক আরবিট্রেশন দিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করে, যা দিলে ক্ষতিপূরণের ফাইল থেকে আরবিট্রেশনের আবেদন সরিয়ে ফেলা হয়।

মাতারবাড়ি প্রকল্পে চিংড়িঘেরের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে দুর্নীতি

প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশে চিংড়িঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে। চিংড়িঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি শতাংশ পরিমাণ জমিতে ১ কেজি চিংড়ি উৎপাদন হবে ধরে নিয়ে এবং এই ১ কেজি চিংড়ির মূল্য ৮০০ টাকা হিসেবে (১৩৩৫ একর X ২৮৮.৬৫ কেজি একরপ্রতি চিংড়ি উৎপাদন X ৮০০ টাকা প্রতি কেজি=৩০,৮২,৮৮,৮৮০ টাকা)। এ ছাড়া সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও বাস্তবে সবগুলো ঘেরে চিংড়ি চাষ হয় না। এভাবে প্রশাসনের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে ব্যাপক সুবিধা অর্জন করেছে।

তথ্য প্রকাশ না করা

প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের পক্ষ থেকে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জনগণকে জানানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না। প্রকল্পের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার উৎস সম্পর্কেও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কিছু জানে না।

জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা বিতরণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি

উভয় প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যে প্রক্রিয়া তার প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিয়মবহির্ভূত টাকা দিতে হয় বলে দেখা গেছে। তথ্যদাতাদের মতে, দুটি পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অনিয়মের শিকার হয়। প্রথমত, বিভিন্ন সনদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে এবং দ্বিতীয়ত, জেলা পরিষদের ভূমি-অধিগ্রহণ শাখায়। নিচে সার্বিকভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়ের চিত্র দেখানো হলো (সারণি-৩)।

২.৪ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাব

২.৪.১ ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পরিবারের বাস্তুচ্যুতি : মাতারবাড়ি ও রামপাল প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে কয়েক শ পরিবার বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অধিকৃত জমিগুলো এলাকার পার্শ্ববর্তী মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করা হলে পরিবারগুলো তাদের আয়-উপার্জনের অবলম্বন হারাবে, ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যাবে।

সারণি ৩ : ক্ষতিপূরণের টাকা বিতরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে প্রদত্ত নিয়মবহির্ভূত টাকা আদায়ের পরিমাণ বা হার

পর্যায়	কার্যাবলি	ঘুষের পরিমাণ	
		মাতারবাড়ি	রামপাল
ইউনিয়ন পরিষদ	১. ৭ ধারার নোটিশ	২০০-৩০০	সরকারি ফির অতিরিক্ত টাকা লাগেনি
	২. ওয়ারিশ সনদ	১২০	
	৩. জন্ম সনদ	১২০	
	৪. খাজনা আদায়	৪৬০ কানি প্রতি	
	৫. ক্ষমতাপত্র (নাদাবি পত্র)	১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণে ৫০০০*	
জেলা ভূমি অধিগ্রহণ অফিস	৬. ফাইল জমা দান	১০০-৫০০	সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি চুক্তির আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকার ৩ থেকে ১০ শতাংশ
	৭. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন**	৫০০-৩০০০	
	৮. কানুনগোর প্রতিবেদন**	৫০০-৩০০০	
	৯. মিস কেসের তারিখ নেওয়া (যদি থাকে)	১০০-২০০	
	১০. চেকে এডভাইস	ক্ষতিপূরণের টাকার ১০ শতাংশ	
	১১. চেকে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর	২০০০-৭০০০	

** প্রায় ৫ শতাংশ মানুষ টাকার বিনিময়ে এই নাদাবিপত্র নিয়েছে।*

** মাতারবাড়ি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ফাইল একাধিকবার সার্ভেয়ার ও কানুনগোর প্রতিবেদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং প্রতিবারই টাকা দিতে হয়েছে। মিস কেসের তারিখে সালিস না বসলে পুনরায় তারিখ নিতে আবারও টাকা দিতে হয়।

কেস : চিংড়িচাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতি

গবেষণায় দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় ১০টি চিংড়িঘেরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এ ১০টি ঘেরের স্থানে ২৫টি ঘের ও ১১৪ ব্যক্তিকে মালিক দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের প্রায় ২৩ কোটি টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। এই দুর্নীতিতে জেলা প্রশাসন ও মৎস্য বিভাগের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সিপিজিসিবিএলের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশ থাকার তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষতিপূরণের তালিকায় যাদের নাম আছে তারা অধিকাংশই চিংড়িঘেরের প্রকৃত অংশীদার নন। আবার সবগুলো ঘের চিংড়ি চাষের ক্ষতিপূরণ পেলেও অনেক ঘেরে চিংড়ির চাষ হয় না। প্রশাসন ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমন্বিত যোগসাজশে এই দুর্নীতি হয়েছে বলে তথ্যদাতারা মনে করেন।

২.৪.২ দারিদ্র্য বৃদ্ধি : ভূমি অধিগ্রহণের ফলে একদিকে ওই ভূমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল বিভিন্ন সম্পূরক পেশায় নিয়োজিত মানুষের আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণে মোট ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৪.৩ প্রকল্পবিরোধী গণরোষ সৃষ্টি : ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়াগত জটিলতা, ক্ষতিপূরণ আদায়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের

প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অসংবেদনশীল আচরণ, প্রকল্প বিরোধিতাকারীদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুমকি এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতনের ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রকল্পবিরোধী গণরোষ সৃষ্টি হচ্ছে। তথ্যদাতাদের মতে, এই গণরোষ দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পগুলোর জন্য স্থায়ী ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

৩. সুপারিশ

৩.১ রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্প-সংক্রান্ত

১. রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

২. মাতারবাড়ি ও রামপাল প্রকল্প-সংক্রান্ত আদালতে দাখিলকৃত রিট আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

৩. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মূল্য নির্ধারণে উপদেষ্টা পর্ষদ ও পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

৪. নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ করে এ দুটি প্রকল্পের সব ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (জমির মালিক ও ইজারাদারদের পাশাপাশি জমির ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল) তালিকা প্রণয়ন ও নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ বিস্তারিত জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে।

৫. ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় ‘ওয়ান স্টপ’ সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.২ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ভূমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত

৮. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে :

- স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বা বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পন্ন করা।
- পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রক্রিয়ায় জন-অংশগ্রহণ।

৯. স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন ১৯৮২ সংস্কার করে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যূনতম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন।

খ. ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনায় জন-অংশগ্রহণ বা মতামত গ্রহণের বিধান রাখা।

গ. জমির স্বত্বাধিকারী ও স্বত্বাধিকারহীন উভয় ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের আওতায় নিয়ে আসা।

১০. কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য আলাদা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্পাদিত অংশীদারত্ব এবং ঋণচুক্তি জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে।

১২. প্রকল্প থেকে পাওয়া লভ্যাংশের একটা অংশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্পের লভ্যাংশ থেকে ভূমি হারানো ব্যক্তিদের জন্য স্থায়ী অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩ সার্বিক

১৩. সার্বিকভাবে বলা যায়, পরিবেশের দূষণ বিবেচনা করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খাতভিত্তিক গবেষণা

স্থানীয় সরকার খাত : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

ফারহানা রহমান, নাহিদ শারমীন ও মো. রবিউল ইসলাম

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাতের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রশাসনিক একাংশের[২৮] স্থানীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার এবং 'রূপকল্প ২০২১'-এ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানকারী খাতগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার অন্যতম। এই খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতিষ্ঠা স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটে এ খাতের স্থানীয় সরকার বিভাগের মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ২২০ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং জিডিপির ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। তবে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার খাতের দুর্নীতি ও অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। গণমাধ্যমে ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত গবেষণাসহ বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ, ২০১২-এ স্থানীয় সরকার সেবা খাতে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১৫০ দশমিক ২ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারি সংস্থার ওপর পরিচালিত অন্যান্য গবেষণাতেও অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি এবং সার্বিকভাবে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। তবে যদিও এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি সংস্থা নিয়ে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার খাতের ওপর সুশাসনবিষয়ক গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। টিআইবির কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এবং এ খাতের ওপর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

---

* ২০১৪ সালের ২৫ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[২৮] ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক অংশ

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- স্থানীয় সরকার খাতের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
- এ খাতের দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন ও এর কারণ নিরূপণ করা।

এই গবেষণায় স্থানীয় সরকার খাত বলতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে সরকারি সংস্থা এবং পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এ ছাড়া যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবায়ন করে, সেহেতু এসব কার্যক্রমও এ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ওপরের উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ গবেষণায় স্থানীয় সরকার খাতের আর্থিক বরাদ্দ, জনবল ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রমের তদারকি, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, স্থায়ী কমিটি, প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তসম্পর্ক, তথ্যের উন্মুক্ততা, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ব্যবহার ও ক্রয়-প্রক্রিয়া, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়, সেবামূলক কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও গবেষণার সময়

এটি মূলত গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরোক্ষ তথ্য বা বিশ্লেষণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেসব তথ্য, বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেমন– সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্থানীয় সরকার বিভাগ, পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় সরকার কমিশনের (বিলুপ্ত) সদস্য, ঠিকাদার, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সাক্ষাৎকার ও পরোক্ষ তথ্য ব্যবহার করে গ্রাম ও শহরকেন্দ্রিক বড় দুটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়নকে কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি,[২৯] টিআইবির গবেষণা,[৩০] অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত খবর,

---

[২৯] এই গবেষণায় স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; জেলা পরিষদ আইন ২০০০; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯; উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১; সিটি করপোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮; পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৩; ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি, ১৯৮২; সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[৩০] এসব গবেষণার মধ্যে রয়েছে জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ (৬৪টি জেলার ৩৫০টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা সংক্রান্ত তথ্য), ৪৩টি জেলায় বেইজলাইন জরিপ (৫৫টি), রিপোর্ট কার্ড জরিপ (৬৪টি), কার্যপত্র (উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওপর গবেষণা।

প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৪-এর মে পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ আইন ও বিধি-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যেকোনো কাজের (কাজ সম্পাদন, বাতিল, স্থগিত, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্পত্তির হস্তান্তর প্রভৃতি) ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গাফিলতি বা অসদাচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে নেই। এ ছাড়া উপজেলা ও জেলা পরিষদের আইনে সংসদ সদস্যদের পরিষদের উপদেষ্টা করে তাদের পরামর্শ গ্রহণের বিধানের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের সময় নির্ধারণ ও তফসিল ঘোষণার সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবে তা সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিতে পরিষদের সদস্য ছাড়া বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাদের অন্তর্ভুক্তির কথা সংশ্লিষ্ট আইনে বলা হয়েছে, তাদের যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এ ছাড়া প্রকল্পের লজিস্টিকস ব্যবহার করার জন্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের কোনো নীতিমালা নেই এবং প্রকল্পের গাড়ি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে বিধিতে উল্লেখ করা হয়নি।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

২.২.১ *স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটি-সংক্রান্ত*

প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কমিটি গঠনের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে আইনে উল্লিখিত সংখ্যার থেকে কম স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হলেও কিছু স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট পরিষদের অনাগ্রহ, বাজেট স্বল্পতা, ও পরিবীক্ষণ না থাকার ফলে কার্যকর থাকে না।

২.২.২ *মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত*

জনবলের স্বল্পতা : বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের বিপরীতে পর্যাপ্ত জনবল নেই। দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চারটি পদের একটি পদে (হিসাবরক্ষক) এখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং অন্য একাধিক অনুমোদিত পদের বিপরীতেও জনবল শূন্য রয়েছে। পৌরসভায় মোট অনুমোদিত জনবলের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং জেলা পরিষদে প্রায় ২০ শতাংশ শূন্য রয়েছে। আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল স্বল্প।

নিয়োগ, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতি : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ক্ষমতার প্রভাব, ঘুষ ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া সুবিধাজনক এলাকায় পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও একই ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান।

সম্মানী ও বেতন-ভাতা : ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার কাউন্সিলরদের সম্মানী কম। পৌরসভার মেয়রদের সম্মানী বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়া হয়। এ ছাড়া বোর্ড মাঝেমধ্যে দেরিতে বসার (ছয় মাস থেকে এক বছর) কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি সুবিধা পেতে দেরি হয়। পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের পরিদর্শকদের পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য মাসিক ভাতা ৬০ টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবেদন লেখা, সঠিকভাবে কর নির্ধারণ, তদারকি ও যথাযথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যেমন– প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়। ফলে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্তরা অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

২.২.৩ *বাজেট প্রস্তুতি ও বরাদ্দ বিতরণ-সংক্রান্ত*

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল, তবে তা প্রতিষ্ঠানভেদে ভিন্ন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (এলজিএসপি ছাড়া) বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, আয়তন ও প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় না। আবার একটি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শেষ কিস্তি দেরিতে ছাড় করার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। বাজেট প্রণয়নসহ সংশোধিত বাজেটের অধীনে স্কিম গ্রহণে দলীয় প্রভাব, মেয়র বা চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র আধিপত্য, ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্প ও বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া এবং অর্থছাড় করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাকে এবং প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের এই হার বরাদ্দের ১ থেকে ১০ শতাংশ হয়ে থাকে।

২.২.৪ *তথ্যের উন্মুক্ততা-সংক্রান্ত*

সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট আইনে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্ত এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণসংবলিত নাগরিক সনদ প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। আবার যেসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে তার অধিকাংশ নাগরিক সনদে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সনদ উন্মুক্ত স্থানে টাঙানো থাকে না। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট আছে, সেখানে প্রয়োজনীয় ও হালনাগাদ তথ্যের অভাব রয়েছে। এ ছাড়া কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নোটিশ বোর্ড নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নোটিশ বোর্ড থাকলেও সেখানে সব তথ্য দেওয়া হয় না।

২.২.৫ *আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)-সংক্রান্ত*

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের ঘুষ আদায় ও উপঢৌকন দেওয়াসহ নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছানুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নিরীক্ষা কর্মকর্তাকে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে ৪০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যেসব নিরীক্ষা আপত্তি লক্ষ করা যায়, এর মধ্যে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, আয়কর বাবদ কম টাকা আদায় করা, ঠিকাদারদের বিল থেকে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করা, রোড রোলারের ভাড়া আদায় না করা, শিডিউলের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত না করা, অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতাবহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়, চেক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেক নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি হয় না।

২.২.৬ *পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-সংক্রান্ত*

জনবলের স্বল্পতার কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবীক্ষণের ঘাটতি লক্ষণীয়। নমুনায়নের ভিত্তিতে পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। কিন্তু নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর প্রতিটি স্কিম ধরে পরিবীক্ষণ করা হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার প্রভাবে কোন স্কিম পরিবীক্ষণ করা হবে সেটি নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ করানো হয়, ফলে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ করা হয় না এবং কাজের মান নিশ্চিত করা যায় না। পরিবীক্ষণে পরিমাণগত তথ্যনির্ভর ছক ব্যবহার করার কারণে কাজের গুণগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এ ছাড়া পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারের কাছ থেকে ঘুষ আদয়ের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

২.২.৭ *আন্তপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়-সংক্রান্ত*

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের মধ্যে কাজের সমন্বয় নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলেও তা কার্যকর নয়। জেলা পরিষদের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয়হীনতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়।

২.৩ অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকস-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় অবকাঠামোগত সমস্যা বিরাজমান। পুরোনো সিটি করপোরেশনগুলোর নগর ভবন ও ওয়ার্ড অফিসগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা ভালো হলেও নতুন সিটি করপোরেশনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পৌরসভার বেশির ভাগ ওয়ার্ডের নিজস্ব অফিস কক্ষ নেই; যেসব ওয়ার্ডের নিজস্ব অফিস আছে তা বেশির ভাগ জরাজীর্ণ ও বসার কক্ষের অভাব আছে। ইউনিয়ন পরিষদের ২৩ শতাংশ ও উপজেলা পরিষদের প্রায় ২৯ শতাংশের নিজস্ব ভবন নেই। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে সদস্য, বিশেষ করে নারী সদস্যদের বসার জন্য আলাদা কোনো কক্ষ নেই। এ ছাড়া বিভিন্ন অধিদপ্তর, বিশেষ করে ওয়াসার জোনাল অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অনেক স্থানীয় কার্যালয় জরাজীর্ণ এবং কক্ষের স্বল্পতা রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদের বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ার, নথিপত্র রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার নেই। এ ছাড়া প্রকল্পের লজিস্টিকস ব্যবহার করার জন্য কোনো নীতিমালা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের নেই। ফলে প্রকল্প শেষে এগুলো অন্য কোনো প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে, না নিলামে তোলা হবে প্রভৃতি নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া কর্মকর্তারা এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রকল্পের গাড়ি ব্যবহার করেন। অনেক সচল গাড়ি গ্যারেজে অকেজো হিসেবে দেখানো হয় এবং সেসব গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি করার ফলে তা অকেজো হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে গাড়ির সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ওয়ার্কশপে পাঠানো হয় এবং ভুয়া বিল দাখিলের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

২.৪ প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৪.১ *রাজনৈতিক প্রভাব* : প্রকল্প প্রণয়নে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব লক্ষণীয়। অনেক প্রকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরও সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকেন, ফলে অনুমোদিত প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে হয় এবং প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

২.৪.২ *উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা* : প্রকল্প পরিকল্পনা বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে করার কথা থাকলেও অনেক সময় তা করা হয় না। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রকল্প প্রণয়নের সাথে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ (এলজিইডি, স্থানীয় সরকার বিভাগ) প্রকল্পের জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যানের মতামত গ্রহণ করে।

২.৪.৩ *সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন* : ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। অনেক সময় স্বজনপ্রীতি এবং যোগসাজশের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা মাঠপর্যায়ে যাচাই না করেই ধারণাসংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকেন।

২.৪.৪ *প্রকল্পের ধারণা থেকে বাস্তবায়ন পর্যায় পর্যন্ত দীর্ঘসূত্রতা* : প্রকল্পের ধারণা পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। যেকোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাস এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে অনেক প্রকল্পের চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘসূত্রতায় প্রকল্প পরিকল্পনা একাধিকবার সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে প্রকল্প ধারণা থেকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান লক্ষ করা যায়।

২.৪.৫ *দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব* : ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ আইনে পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তা প্রণয়ন করা হয় না।

২.৫ উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৫.১ *দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়ম :* উন্নয়নমূলক কাজের ক্রয়ে দরপত্র প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অনিয়ম হয়ে থাকে। অনেক সময় পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যেসব দরপত্রের উন্মুক্ত আহ্বান করা উচিত, তা না করে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। ফলে সরকার রাজস্ব হারায়। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগেই ঠিকাদার অবহিত হওয়া, পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, শিডিউল প্রাপ্তির জন্য সীমিত সময় দেওয়া, শিডিউল কেনার সময় রাজনৈতিক প্রভাব, রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র শিডিউল জমা, দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে না দেওয়া, অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে শিডিউল জমা দেওয়া, শিডিউল জমার ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতা না পাওয়া, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত না হওয়া ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়।

২.৫.২ *কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় অনিয়ম :* জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং মন্ত্রী বা তার আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা দরপত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এ ছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনায় কাজ বণ্টন করা হয়। অনেক সময় জনপ্রতিনিধিদের আস্থাভাজনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কাজের বরাদ্দের ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কাজ দেওয়ার জন্য আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, এই হার সিটি করপোরেশন এবং এলজিইডির ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ শতাংশ। কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মেয়র, বাস্তবায়ন কমিটি অথবা অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর সমঝোতা হয়ে থাকে এবং তারা কমিশন পেয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ, সমঝোতাকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, যা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও এলজিইডির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

২.৫.৩ *বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতি :* প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। যেমন–একই প্রকল্প একাধিকবার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া প্রকল্প (কাগজপত্রে প্রকল্পের নাম থাকলেও বাস্তবে কিছু করা হয়নি) দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, অর্ধেক কাজ করে অর্থ আত্মসাৎ, আগের শেষ হওয়া প্রকল্পের কাজ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, চলমান এক প্রকল্পের কাজ অন্য প্রকল্পে দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের স্কিমের নকশা প্রণয়নে সহায়তা পেতে এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীকে বরাদ্দের ২ থেকে ৩ শতাংশ এবং ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরকে ক্ষেত্রবিশেষে ঘুষ, উপঢৌকনসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়।

ইউপিপিআর প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের মেয়র, নির্বাহী কর্মকর্তা ও টাউন ম্যানেজার স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ছাড়কৃত অর্থের কিছু অংশ আত্মসাৎ করেন এবং এসব প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও কম টাকায় কাজ করিয়ে নিয়ে বেশি টাকা বিল করে অর্থ আত্মসাতের তথ্য পাওয়া যায়।

২.৬ লজিস্টিকস ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

পণ্য ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে যোগসাজশ করে টাকার বিনিময়ে শিডিউল জমা দেওয়ার আগে দরপত্রের মূল্য ঠিকাদারকে জানানো হয়। উন্মুক্ত দরপত্র এবং কোটেশন পদ্ধতিতে কাজ পেতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি মেয়র বা চেয়ারম্যান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্ত কাজের মূল্যের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়। কাজের বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে লজিস্টিকস না কিনে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়, আবার কম দামে কিনে দাম বেশি দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

২.৭ সেবা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৭.১ *সনদ প্রাপ্তি* : টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১২-এর তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, প্রত্যয়নপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সনদ) সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হয়। এসব অনিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় (৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ) ও সময়ক্ষেপণ (৮ দশমিক ২ শতাংশ)। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে গড়ে ৯৪ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

২.৭.২ *সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম* : টিআইবির জাতীয় খানা জরিপ ২০১২-এর তথ্য অনুযায়ী, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়, যার মধ্যে ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে গড়ে ১ হাজার ৪৮ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এ ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হতে সময়ক্ষেপণ, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি এবং প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। বরাদ্দ বিতরণের সময় ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা হয় ও কখনো কখনো সম্পূর্ণ বরাদ্দ আত্মসাৎ করা হয়। কেউ মারা গেলে কাউন্সিলররা সেই সদস্যের খানার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে কার্ড গ্রহীতাকে অসুস্থ লিখে দেন ও মৃত ব্যক্তির খানার টাকা অন্য সদস্য উত্তোলন করেন। এ ছাড়া টিআর ও কাবিখার বরাদ্দ এবং বিলের টাকা ছাড় করতে পিআইওকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে মাঝে মাঝে গুদাম থেকে বরাদ্দ কম দেওয়া হয়।

২.৭.৩ *বিচার ও সালিস* : গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসহযোগিতার মনোভাব রয়েছে। ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপ অনুযায়ী, যেসব খানার সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিচার ও সালিস-সংক্রান্ত সেবা নিয়েছিলেন, তার ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ খানার সদস্য জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হন। এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে ছিল সময়ক্ষেপণ, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর হস্তক্ষেপ, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ও প্রতারণা। যেসব খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪ হাজার ৫২১ টাকা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া বিচার-সালিসের লিখিত রায় বাদী-বিবাদীকে প্রদান ও সংরক্ষণ করা হয় না।

২.৭.৪ ট্রেড লাইসেন্স : অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীদের দালাল অথবা লাইসেন্স সুপারভাইজারকে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে লাইসেন্স পেতে অনেক সময় লাগে। টিআইবি পরিচালিত খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ৯০ দশমিক ৭ শতাংশকে নির্ধারিত ফির চেয়ে অতিরিক্ত গড়ে ৪৫৬ টাকা করে দিতে হয়েছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অথবা দালাল অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় নথি বিক্রি করে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে তদারকির ঘাটতি থাকার ফলে একটি ব্যবসার লাইসেন্স ব্যবহার করে একাধিক ধরনের ব্যবসা করা হয়।

২.৭.৫ হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ ও প্রদান : ম্যানুয়াল হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর ব্যবস্থাপনা জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। কম বা অধিক মূল্য নির্ধারণ এ ক্ষেত্রে একটি নিয়মিত সমস্যা। ঘুষ না দিলে সাধারণত অধিক কর নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া পুনর্মূল্য নির্ধারণ অনিয়মিত ও নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। টিআইবি পরিচালিত খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর সর্বাধিক ৭৯ শতাংশকে গড়ে ২৬০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এ ছাড়া সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন এলাকায় বাড়ি থেকে হোল্ডিং কর আদায়ের সুযোগ থাকায় সংগৃহীত রাজস্বের অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

২.৭.৬ পানি পরিষেবা : বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ওয়াসাগুলো থেকে পানি পরিষেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয়। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে নতুন সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ দাবি, রাস্তা কাটার অনুমতি পেতে ঘুষ দেওয়া, পরিদর্শন রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অফিসে বারবার যোগাযোগ, কাগজপত্র ঠিক থাকার পরও সময়ক্ষেপণ, অফিস কর্তৃক আবেদনপত্র হারানো, পুনঃসংযোগ পেতে ঘুষ দেওয়া, পাইপলাইনের আকার বর্ধিতকরণের জন্য অতিরিক্ত টাকা দেওয়া, ভৌতিক বিল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নলকূপ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, টাকা নিয়েও নলকূপ না দেওয়া ইত্যাদি অনিয়মের তথ্য পাওয়া যায়।

২.৭.৭ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা : ময়লা পরিবহনকারী গাড়ির চালকেরা ময়লা পরিবহনের জন্য কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট যতগুলো ট্রিপ বরাদ্দ করে তা থেকে কম ট্রিপ দিয়ে অব্যবহৃত ট্রিপের তেল বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেন। কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টররা কর্মচারীদের বেতনের আংশিক টাকা অবৈধভাবে কেটে রাখেন, শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ কর্মসূচির কর্মচারীদের মজুরির টাকা মিথ্যা স্বাক্ষর বা টিপসই দিয়ে তুলে আত্মসাৎ করেন। এ ছাড়া আবর্জনা নিয়মিতভাবে অপসারণ না করা, রাস্তায় ইট, বালি, পাথর ও অন্যান্য ময়লা ফেলে রাখার জন্য সাজা ও জরিমানার বিধান থাকলেও তা যথাযথ প্রয়োগ না করা ইত্যাদি অনিয়ম আবর্জনা ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হয়।

২.৮ স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

২.৮.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কে নেবে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালায় উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সরকার স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচনের সময় নির্ধারণ এবং তফসিল ঘোষণার

ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে (জেলা পরিষদ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিলম্বিত করে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপজেলা পরিষদে এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

২.৮.২ *আর্থিক সক্ষমতা :* অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় যথেষ্ট নয়, ফলে বাজেট প্রণয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রতিটি ধাপে সরকারের সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। আর্থিক নির্ভরশীলতার এই হার সবচেয়ে বেশি ইউনিয়ন পরিষদে (৫৬ থেকে ৯০ শতাংশ)।

২.৮.৩ *জবাবদিহি :* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা কাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা অনেক সময় জবাবদিহির বাইরে থেকে যান। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের জানার জন্য কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে রাখা ও এ-সম্পর্কে জনগণের আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনায় নেওয়ার কথা থাকলেও গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তা অনুসরণ করে না। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্ততা কম দেখা যায় এবং বাজেটে জনমতের প্রতিফলন হয় না। আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও আইন অনুযায়ী তারা জনগণের কাছে নন, বরং সরকারের কাছে দায়বদ্ধ।

২.৮.৪ *সিদ্ধান্ত গ্রহণ :* স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের প্রভাব, পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, দলীয় রাজনীতি ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

২.৮.৫ *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ঘাটতি :* জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ে শুধু বরাদ্দ বিতরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। অন্য পাঁচটি নির্দেশকের (আয়ের পরিসর বৃদ্ধিকরণ, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ, জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিতকরণ, স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রবর্তন) ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। এ ছাড়া জাতীয় বাজেটে এ খাতে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও অন্যান্য খাতের সাপেক্ষে বরাদ্দের হার কমে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

২.৮.৬ *সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের দুর্বল অবস্থান :* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে তারা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন না। এ ছাড়া স্থায়ী কমিটি, বিচার ও সালিস এবং বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় না।

২.৯ স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ

২.৯.১ *সুশাসনের ঘাটতির কারণ*

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, বাতিল বা স্থগিতকরণ) কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।

রাজনৈতিক দলীয়করণ : স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা রাখার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের (দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে কার্যাদেশ প্রদান ও কার্যসম্পাদন) প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান। এলাকার উন্নয়নে বিরোধী দল-সমর্থিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজের সুযোগ সীমিত। এ ছাড়া নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

দীর্ঘসূত্রতা : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রকল্পের ধারণা থেকে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, স্কিমের নাম পরিবর্তন করা, অনুমোদনের জন্য স্বাক্ষর দিতে দেরি করা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তহবিলে টাকা না থাকা, অবৈধ অর্থের প্রত্যাশায় অর্থছাড় না করা প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও খরচ বৃদ্ধি পায়।

প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি : স্থানীয় সরকার খাতকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা নেই। এ ছাড়া লজিস্টিকস ব্যবহার-সংক্রান্ত নীতিমালা ও স্থায়ী কমিটির কাজের আওতা-সংক্রান্ত বিধিমালা নেই।

আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের ঘাটতি : স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। আইন অনুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন না করা, নাগরিক সনদ না থাকা, ওয়ার্ড সভা না হওয়া, নির্বাচন আচরণবিধিমালা, সরকারি গাড়ি বিধিমালার লঙ্ঘন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, হোল্ডিং কর, ট্রেড লাইসেন্স বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

আর্থিক সক্ষমতার অভাব : অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।

জনবল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা : কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণ ও পদায়নে নানা ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি থাকার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত কাজ ও সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ফলাফল প্রভাব ও বিশ্লেষণ

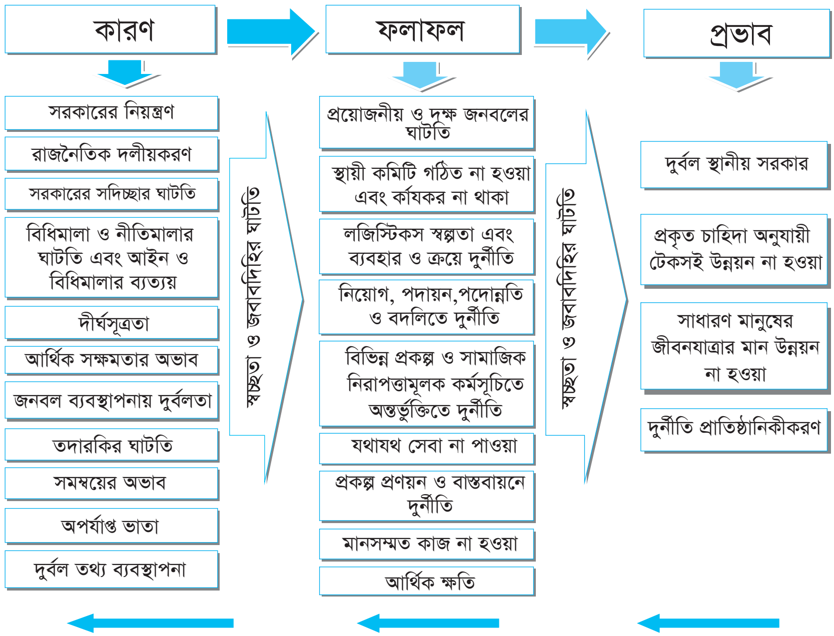

তদারকির অভাব : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় প্রশাসনিক, কাজ বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন লজিস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকে না। ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়।

সমন্বয়ের অভাব : স্থানীয় সরকারের কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়, যে কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক সময় ব্যাহত হয়। এ ছাড়া সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়।

অপর্যাপ্ত ভাতা : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্যদের ভাতা-স্বল্পতার কারণে তদারকি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না; যা দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে।

দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনা : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারণায় ঘাটতি রয়েছে। সেবাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য সাধারণ জনগণ জানতে পারে না।

২.৯.২ *স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব*

স্থানীয় সরকার খাতের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের কারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি হয় না, ফলে স্থানীয় উন্নয়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না ও টেকসই হয় না। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ও বরাদ্দ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয় না। সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের দুর্বলতার কারণে স্থানীয় সরকার খাতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩. সুপারিশ

৩.১ নীতিনির্ধারণী পর্যায়

১. উপজেলা ও জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরিষদকে কাজ করতে দিতে হবে।

২. প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষম বণ্টন করতে হবে।

৩. যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানে দ্রুত নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, আয়তন ও প্রয়োজন বিবেচনা করতে হবে।

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদে) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে সরেজমিন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করাতে হবে। এ ছাড়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যাপ্তি ও গভীরতা বাড়াতে হবে।

৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিগুলোর গঠন নিশ্চিত করতে হবে ও এসব কমিটি সক্রিয় করতে নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯. জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেটের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সিংহভাগ বরাদ্দ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে।

১০. সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সুষম মিশ্রণসংবলিত নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে

হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো কাজের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা ও সব প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সিএজি কর্তৃক নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরীক্ষা-সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১২. স্থানীয় সরকার খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্নীতি, যেমন– প্রকল্প ও বিশেষ বরাদ্দের অর্থছাড়, নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় ও সেবা প্রদানসহ অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি দূরীকরণে তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণসহ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৩. বাজেট প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং বাজেটে জনমতের প্রতিফলন থাকতে হবে। উন্মুক্ত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বাজেট প্রকাশ করতে হবে।

১৪. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারকি ব্যবস্থায় জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে 'জনগণের মুখোমুখি' কার্যক্রম আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

১৫. ক্রয় কমিটিতে স্থানীয় সচেতন ও যোগ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ই-প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।

১৬. সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরে নাগরিক সনদ থাকতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রকাশ করতে হবে এবং এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিক সনদে অবশ্যই প্রযোজ্য সব সেবার ফি উল্লেখ করতে হবে।

১৭. তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানীয় নাগরিক সংগঠন, গণমাধ্যম ও সাধারণ জনগণের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্পষ্টীকরণ ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়নসহ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা শুধু রসিদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করতে হবে।

২০. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বক্সস্থাপন করতে হবে ও প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

২১. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ইউনিট গঠন ও সক্রিয় করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অর্থ বিভাগ (২০১৩) 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩', অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আকরাম, শাহজাদা এম (২০১৩) 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা', ঢাকা : টিআইবি।

আলম, মো. খোরশেদ (২০১২) 'সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ : ঝিনাইদহ পৌরসভা', ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহ সনাক।

আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯) 'বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার', ঢাকা : গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

ঢাকা সিটি করপোরেশন (২০০৭) 'নিরীক্ষা প্রতিবেদন : ২০০৬-২০০৭', ঢাকা।

মাহমুদ, তানভীর (২০০৬), 'করাপশন ডেটাবেস ২০০৫', ঢাকা : টিআইবি।

রহমান, মো. হাবিবুর ও নাহিদ শারমীন (২০১১) 'কার্যকর উপজেলা পরিষদ : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়', ঢাকা : টিআইবি।

রহমান, মো. মকসুদুর (২০০০) 'বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড।

শারমীন, নাহিদ (২০১৪) 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়', ঢাকা : টিআইবি।

শারমীন, নাহিদ ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩) 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর : সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', ঢাকা : টিআইবি।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (২০০৮) 'সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮', বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, 'বাৎসরিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪', অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

হক, মো. শরিফুল ও অন্যান্য (২০১২) 'স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী জনপ্রতিনিধি : সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও করণীয়', ঢাকা : টিআইবি।

Asian Development Bank (2005) ' Supporting Urban Governance Reform (ADB TA NO. 4003-BAN)', Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya, Mobasser Monem and Umme Shefa Rezbana (2013) 'Finance for Local Government in Bangladesh: An Elusive Agenda', Dhaka:CPD.

CARE (2012) 'Poor and Extremely Poor Women's Engagement in Local Government Development Initiatives', Dhaka.

Chowdhury, Amirul Islam (2005), 'Instruments of Local Financial Reform and Their Impact on Service Delivery, Institutional and Development Concerns: Case Studies of India And Bangladesh', Dhaka:Centre for Urban Studies.

http://www.lgd.gov.bd/images/pdf/download/lgd/four%20yrs%20achievment.pdf (১২

ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

http://www.mof.gov.bd/en/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=1 (২৩ ডিসেম্বর ২০১৩)

Ministry of Finance, Government of Nepal, National Budget, 2014, http://www.mof.gov.np/uploads/cmsfiles/file/English_complete(1)_20130729034813.pdf (২৫ এপ্রিল ২০১৪)

Panday. Pranab Kumar (2011) 'Local Government System in Bangladesh: How Far is it Decentralised?' in Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Vol. 9:3, pp. 205 - 230.

PPRC (2012) 'Social Safetynets in Bangladesh' (Volume2: Ground Realities and Policy Challenges), Dhaka.

Siddiqui, Kamal (1999) 'Local Government in Bangladesh', Dhaka: University of Press Limited.

Talukdar, Mohammad Rafiqul Islam (2013) 'Decentralized Local Governance Policy Framework for Bangladesh', Dhaka:IGS.

TIB (2009) 'Baseline Survey Report: LGIs', Dhaka.

TIB (2011) 'Baseline Survey Report: LGIs', Dhaka.
Union Budget,

2013-2014-http://indiabudget.nic.in/budget2013-2014/ub2013-14/bag/bag2013.pdf (২৫ এপ্রিল ২০১৪)

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মোহাম্মদ হোসেন ও নিহার রঞ্জন রায়

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সমবায় হচ্ছে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যা যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সমবায়কে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানত ২৯ ধরনের মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ টি এবং এসব সমিতির মোট সদস্যসংখ্যা ৯৩ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৭ জন। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সমবায় সমিতির অবদান ১ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

সমবায় সমিতিগুলো বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বহুমুখী এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে। যেমন : ভুল তথ্য দিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন গ্রহণ, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ আমানত ও মূলধন সংগ্রহ করে তা আত্মসাৎ, অবৈধ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ, সমিতির অর্থ অন্যান্য কোম্পানিতে নিয়মবহির্ভূতভাবে স্থানান্তর, সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা ইত্যাদি। একটি সমীক্ষা অনুসারে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ৪৭ শতাংশ অকার্যকর হয়ে গেছে। সমবায় খাতের বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর গভীর ও বিশ্লেষণার্থক গবেষণার অভাব রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনগত চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা;
- সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা; এবং
- সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা।

* ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত সমবায় সমিতি-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সব সমিতির ক্ষেত্রে এবং সমবায় অধিদপ্তর-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে তা সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসনগত চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলোর ওপর ধারণা দেয়।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণায় বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন– মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলোচনা মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে এসব তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সমিতির ধরন, স্তর, তদারকি সংস্থা ও ভৌগোলিক বিন্যাস এ চারটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে ছয়টি বিভাগের আটটি জেলার ১১টি উপজেলার মোট ৩৭টি সমবায় সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সমবায়-সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আটটি সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সমবায় খাতসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বার্ষিক প্রতিবেদন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মে মাস থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২. ১ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা

'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' অনুসারে সমবায় সমিতিগুলো পরিচালিত হয়। ২০০২ ও ২০১৩ সালে এই আইনের কয়েকটি ধারায় সংশোধন আনা হয়। 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সংশোধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাধানিষেধ [ধারা ২৩খ (১, ২)], (খ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ছাড়া কোনো সমবায় সমিতির শাখা খোলায় বাধানিষেধ এবং শাখা বন্ধ করা [ধারা ২৩ ক (১)], (গ) সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদানে বাধানিষেধ [ধারা ২৬ (১), (ঘ) আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনের নির্দেশ [ধারা ২৬খ (১)]। ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা জারি করা হলেও সংশোধিত আইন অনুসারে এই বিধিমালাকে হালনাগাদ করা হয়নি। বিভিন্ন সময় আইনানুসারে পরিপত্র জারির মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ ১৯৮৯ সালে সমবায় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল।

সমবায় সমিতি আইনে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায় থেকে প্রাক-যোগ্যতা যাচাই, আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। এ ছাড়া আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন বিষয়ে সমিতিগুলোকে বাধ্য করার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সমবায় সমিতির দ্বারা

সদস্যরা দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হলে নিবন্ধকের অনুমতি ছাড়া আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া সমিতির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন সম্পাদন করতে না পারলে পরবর্তী যে অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন হবে, সেই কমিটিতে সদস্য হতে না পারার কারণে অন্তর্বর্তী কমিটি গঠনের জন্য সদস্য পাওয়া যায় না।

২.২ সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.২.১ *সমিতি নিবন্ধন*

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমিতির নিবন্ধন

নিবন্ধনের শর্তাবলি মাঠপর্যায়ে যাচাই না করেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে/নির্দেশে সমবায় সমিতির নিবন্ধন দেওয়া হয়, বিশেষ করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোর নিবন্ধন দেওয়ার যোগ্যতা যাচাইয়ের বিষয়টি গৌণ থাকে। অন্যদিকে বিআরডিবি সমিতি সংগঠিত করে স্থানীয় সমবায় অফিসের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে, যেখানে সমবায় অধিদপ্তরের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি থাকে না।

রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের প্রভাবে সমিতির নিবন্ধন

সরকারি কোনো অনুদান বা খাস সম্পদ ইজারা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সমবায় সমিতি গঠন করে নিবন্ধন নেয়, যেখানে যোগ্যতা যাচাই করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, সংসদ সদস্য, এমনকি মন্ত্রীও সমিতির নিবন্ধন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করেন।

নিবন্ধনের পুরো প্রক্রিয়া সমবায় কর্মকর্তার সাথে আর্থিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা

প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়াটি সমবায়ের কোনো কর্মকর্তার সাথে আর্থিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই সার্বিক প্রক্রিয়ায় সমবায় কর্মকর্তা একটি 'প্যাকেজ' হিসেবে সমিতির কাছে অর্থ দাবি করে, যার পরিমাণ ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়।

নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির নিবন্ধন প্রদান

প্রাথমিক সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফির বাইরে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। নিয়মবহির্ভূত এই অর্থের পরিমাণ সমবায় সমিতির ধরন ও কর্ম-এলাকার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সমিতি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার একটি থানা নিয়ে কাজ করলে ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা, সমগ্র ঢাকা মেট্রোপলিটন নিয়ে কাজ করলে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা ও সমগ্র ঢাকা জেলা নিয়ে কাজ করলে ৭০ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূত দিতে হয়।

সমিতির কর্ম-এলাকা নির্ধারণে অনিয়ম

নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির কর্ম-এলাকা বর্ধিত করা যায়। সমবায় অধিদপ্তরে সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে এই অনুমতি নেওয়া হয়। তথ্যদাতাদের মতে, নিয়মবহির্ভূত

অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বহুমুখী সমবায় সমিতিকে তাদের কর্ম-এলাকার আওতা বাড়িয়ে অবৈধ কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

২.২.২ *সমবায় সমিতির উপ-আইন*

উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্যগুলো অনির্দিষ্ট

সমবায় সমিতির উপ-আইনে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালি সুনির্দিষ্ট থাকে না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কোনো কোনো সমিতির উপ-আইনে সমিতির ২০টির অধিক উদ্দেশ্য লেখা আছে। সমিতির উদ্দেশ্য এভাবে উন্মুক্ত রাখার কারণে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষে সমিতিগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর উপ-আইনের উদ্দেশ্যগুলো সমিতির ধরনভেদে ৫-৭টির মধ্যে নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সমিতির উপ-আইনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করা

সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমবায় কর্তৃপক্ষ সমিতির উপ-আইনে কী কী বিষয়ের উল্লেখ আছে, উপ-আইন সমবায় আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কি না, এ বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। গবেষণায় দেখা যায় সমিতির ধরন আলাদা হলেও বেশির ভাগ সমিতির উপ-আইনের ধরন প্রায় একই রকম।

উপ-আইন অনুসরণের বিষয়ে তদারকির অভাব

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমিতিগুলোর উপ-আইন অনুসরণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত তদারকি নেই। সমিতিগুলো কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে কোনোভাবে উপ-আইন লঙ্ঘন করছে কি না, সে ব্যাপারে অধিদপ্তর কর্তৃক তদারকির ঘাটতি আছে।

২.২.৩ *সমবায় সমিতি নিরীক্ষা*

নিরীক্ষা সম্পাদনে অপর্যাপ্ত সময়

যথাযথভাবে নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পর্যাপ্ত সময় পান না। কিছু উপজেলায় সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি সমিতির নিরীক্ষার দায়িত্ব পড়ে এবং সমিতি নিরীক্ষার জন্য গড়ে এক দিনের বেশি সময় পায় না। এই অল্প সময়ে সমিতির কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া কিছু বড় সমিতি আছে যাদের কার্যক্রম বেশি এবং নিরীক্ষা সম্পাদন করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে।

নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব

যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করেন তাদের অনেকেরই নিরীক্ষা সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই, এমনকি নিরীক্ষা বিষয়ে অনেকের পর্যাপ্ত ধারণাও নেই। নিরীক্ষা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকগণ কেবল ভাউচার মিলিয়ে দেখেন।

সমবায় কর্মকর্তাদের নিরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব

সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত প্রশিক্ষণগুলোও গতানুগতিক। অনেক সমবায় কর্মকর্তা যারা

নিরীক্ষা সম্পাদন করেন তারাও নিরীক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পাননি। এ ছাড়া নিরীক্ষার নতুন ম্যানুয়ালের ওপর অনেক নিরীক্ষা কর্মকর্তারই প্রশিক্ষণ নেই।

নিবন্ধনের আগে সমিতির প্রাথমিক নিরীক্ষা না হওয়া

নিবন্ধনের সময় প্রতিটি সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা হওয়ার নিয়ম আছে। প্রাক-নিরীক্ষাকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী সময়ে সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। কিন্তু নিবন্ধনের সময় সমিতির কেবল একটি নামমাত্র নিরীক্ষা হয়।

অপূর্ণাঙ্গ ও অনিয়মিত নিরীক্ষা সম্পাদন

অকার্যকর সমিতি এবং কোনো কোনো কার্যকর সমিতির পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে সমিতির সব ধরনের প্রকল্প না দেখে শুধু কয়েকটি প্রকল্প দেখেই নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অফিস সমবায় সমিতির সরবরাহকৃত কাগজপত্র ভালোভাবে তদন্ত করে দেখে না। প্রতিটি সমিতির বছরে একবার নিরীক্ষা সম্পাদনের নিয়ম থাকলেও অনেক সমিতিতে তা হয় না।

সমবায় কর্মকর্তার নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

যেসব সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরীক্ষা সম্পাদন করার দায়িত্ব পান, তারাই সমবায় সমিতির সাথে আর্থিক চুক্তিতে সমিতির হিসাব প্রস্তুত করেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে দেওয়ার মাধ্যমে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করেন, যার পরিমাণ সাধারণত এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা। কার্যকর ও লাভজনক সমিতির ক্ষেত্রে এই অর্থের পরিমাণ বেশি। সমবায় কর্মকর্তারা নিরীক্ষার সময় বিভিন্ন ভুল দেখিয়ে সমিতির কাছ থেকে টাকা দাবি করেন; অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলো নিরীক্ষার সময় কোনো ভুল ধরা পড়লে টাকার বিনিময়ে সেটি শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

নিরীক্ষায় সমিতির লাভ কম দেখানো

নিয়ম অনুসারে সমিতির লাভের ১০ শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নিরীক্ষা ফি হিসেবে জমা দিতে হয়। নিরীক্ষার কর্মকর্তারা প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্যদের পরামর্শে নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সমিতির লাভ কম দেখান।

নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

বিআরডিবির অধীন সমিতিগুলোর নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। ২০১১-২০১২ সালে বিআরডিবির সমিতিগুলোর নিরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিআরডিবিকেই। কিন্তু একদিকে বিআরডিবির জনবলের অভাব এবং অন্যদিকে বিআরডিবির মাঠপর্যায়ের জনবলের এ কাজে দক্ষতার অভাব আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বছর নিরীক্ষার দায়িত্ব পুনরায় সমবায় অধিদপ্তরের কাছে দেওয়া হয়। এ ধরনের সমন্বয়হীনতা নিরীক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। সম্প্রতি নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২.২.৪ *সমবায় সমিতি পরিদর্শন*

অধিদপ্তরের জনবলের স্বল্পতা

কিছু উপজেলায় সমিতির সংখ্যা (৪০০-৫০০টি) অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবলের তুলনায় বেশি। ফলে এসব উপজেলার ক্ষেত্রে সবগুলো সমিতি নিয়মিত পরিদর্শন বা তদন্ত করা সম্ভব হয় না।

প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যাতায়াত ভাতার অভাব

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের নিজস্ব গাড়ি নেই। অন্যদিকে নিরীক্ষা, পরিদর্শন বা তদন্ত-সংক্রান্ত কাজে সমিতিগুলোতে যাওয়া-আসার জন্য সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত যাতায়াত ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় (কিমি প্রতি শূন্য দশমিক ৭৫ বা সর্বোচ্চ ৮০ টাকা)। এ ছাড়া পরিদর্শনের পর যাতায়াত ভাতার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা আছে। কিছু ক্ষেত্রে যাতায়াত ভাতার বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন পেতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

অকার্যকর সমবায় সমিতি পরিদর্শনের ব্যবস্থা

প্রতিবছর একবার প্রতিটি প্রাথমিক সমিতি উপজেলা সমবায় পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের কথা থাকলেও বাস্তবে এটি হয় না। অনেক সময় উপপরিদর্শক মাঠে গিয়ে সমিতি না দেখেই পরিদর্শনের প্রতিবেদন দেন।

সমিতি থেকে সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়মবহির্ভূত সুবিধা আদায়

সমবায় কর্মকর্তাদের একাংশ পরিদর্শনের সময় সমিতির কাছে যাতায়াতের জন্য অর্থ দাবি করে, যা না দিলে এসব সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম অনুমোদনের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণসহ হয়রানি, পরিদর্শনের প্রতিবেদন খারাপ দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এ ছাড়া কৃষিসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সাথে নিয়োজিত সমিতিগুলোতে পরিদর্শনে গেলে ওই সব সমিতির উৎপাদিত পণ্য সমবায় কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়। সমবায় কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত ভ্রমণে এসব এলাকায় গেলেও তাদের বিলাসবহুল হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

সমিতি পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি

সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি করেন। কিছু ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলে সমিতির পরিদর্শনের প্রতিবেদন তৈরি করেন। এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকে এবং এই বিলের অনুমোদন দিয়ে তারাও নিয়মবহির্ভূত অর্থ দাবি করেন।

অফিস সহকারী কর্তৃক সমিতির পরিদর্শন

অনুমোদিত না হলেও একটি উপজেলা সমবায় অফিসের অফিস সহকারী সমিতি পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন ভ্রমণ বাবদ যাতায়াত ভাতার বিল দাবি করেন।

২.২.৫ *ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন*

সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে সমবায় অধিদপ্তরের প্রভাব বিস্তার

সমিতির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সমবায় কর্মকর্তারা তাদের অনুগত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার চেষ্টা করেন। ভোটার তালিকায় গরমিল, বহিরাগতদের ভোটার বানিয়ে জাল ভোট প্রদান, মনোনয়ন বাছাই এবং নির্বাচিত কমিটিকে অনুমোদন প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অনিয়মগুলো হয়।

২.২.৬ *বিরোধ নিষ্পত্তি*

বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সীমিত ক্ষমতা

বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের পরামর্শ দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই। এই সীমিত ক্ষমতার কারণে সমবায় সমিতির সদস্যরা বিরোধ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত কাজে সমবায় অধিদপ্তরকে ব্যবহার করে না। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গেলে তিনি আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে আসেন, ফলে বিরোধ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ আর সমবায় অধিদপ্তরের হাতে থাকে না।

সমিতির বিরোধকে কেন্দ্র করে সমিতির থেকে সুবিধা আদায়

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিতে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা না করে সমবায় কর্মকর্তারা সমিতির ক্ষমতাশীল পক্ষকে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে সমিতির থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। এই যোগসাজশের ফলে সমিতির সম্পদকে ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি হয়।

রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালীদের হস্তক্ষেপ

কোনো সমিতির অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের প্রভাবের কারণে সমবায়ের কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্দেশমতো কাজ না করলে কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের মন্ত্রী পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরে তদবির করেন।

২.২.৭ *অবসায়ন*

প্রয়োজনীয় দলিলপত্র না থাকা

সমিতির নথিপত্র, দলিলপত্র, পাওনাদার, দেনাদারদের তালিকা, ঠিকানা ও প্রমাণাদি, দায় ও সম্পদের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড না পাওয়ার কারণে অবসায়ন আদেশপ্রাপ্ত সমবায় সমিতিগুলোর অবসায়ন সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাব

অবসায়ন-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মামলা দায়ের, সভা করা, পত্র জারি করা, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব কাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় অবসায়ন কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

সমিতির কাছে সরকারি ঋণ থাকা

সমিতির কাছে সরকারি ঋণ অপরিশোধিত থাকা এবং সমিতিতে থাকা সম্পদের সুষ্ঠু বিলি বণ্টন না হওয়া পর্যন্ত অবসায়ন করা যায় না। অন্যদিকে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে অকার্যকর সমিতিগুলো একটি অমীমাংসিত অবস্থায় আছে।

২.২.৮ *উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ*

উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত না থাকা

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, অনুদান ও উৎসাহ-সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত নয়। প্রশিক্ষণের জন্য লজিস্টিকসসহ অন্যান্য সামর্থ্য পর্যাপ্ত নয়।

সমবায় সমিতির অস্পষ্ট স্তর বিভাজন

সমবায় সমিতির প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের স্তরায়ন সব সময় স্পষ্ট নয়। প্রতিটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে ১০টি প্রাথমিক সমিতি থাকার কথা থাকলেও এমন কেন্দ্রীয় সমিতি আছে যার কোনো প্রাথমিক সমিতি নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতির কোনো কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতি নেই।

জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকরতার অভাব

জাতীয় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতিকে এবং কেন্দ্রীয় সমিতি প্রাথমিক সমিতিকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। আগে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে জাতীয় সমিতির নিজস্ব পুঁজি থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঋণ-কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়ায় কৃষক পর্যায়ে সমবায় ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা কমে গেছে। সমবায় ব্যাংকের তিন-স্তরের সমিতির ব্যবস্থা এখন আর কার্যকরভাবে অনুসরণ হচ্ছে না।

সমবায়বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ

সরকার বিভিন্ন সময় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেখানে নিবন্ধিত সমিতিকে অন্তর্ভুক্ত না করে নতুন সমিতি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে। এভাবে চাপে পড়ে সমিতি গঠনের ফলে সদস্যদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তঃসংযোগ থাকে না। এসব সমিতি সরকারি অনুদাননির্ভর। সমবায় অধিদপ্তর এসব সমিতির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হলেও সমিতিগুলোর সার্বিক পরিকল্পনায় সমবায় অধিদপ্তর কীভাবে যুক্ত তা অনেক সময় সুনির্দিষ্ট থাকে না।

সরকারের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা না থাকা

বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমবায়ের কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করেছে। ১৯৯৩ সালে সরকারের পক্ষ থেকে 'কৃষিঋণ' মওকুফ করার ঘোষণা দেওয়া হয়, ফলে

সমিতির যেসব সদস্য কৃষিঋণ নিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে ঋণ উত্তোলন বন্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে 'কৃষিঋণ' মওকুফের আওতায় সমবায় সমিতি পড়বে না বলে জানানো হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনাদায়ী থেকে যাওয়া ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বহুসংখ্যক সমিতির কৃষিঋণ অনাদায়ী থেকে যায়। উল্লেখ্য, ১৯৮০র দশকেও এ ধরনের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচারণার সীমাবদ্ধতা

উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সমবায় অফিসগুলোতে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা নেই সঠিকভাবে তথ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ না করার ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিকসের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেশির ভাগ জেলায় সমবায়ের নিজস্ব কার্যালয় নেই। জেলা ও উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের কার্যালয়গুলোতে আসবাবসহ আনুষঙ্গিক উপকরণের স্বল্পতা আছে। অনেক উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা নেই অথবা থাকলেও নষ্ট হলে মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা আদায়ের উদ্যোগ না নেওয়া

সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির দ্বারা প্রতারণার শিকার গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আইডিয়াল, ম্যাক্সিম, ডেসটিনিসহ অন্যান্য প্রতারক বহুমুখী সমবায় সমিতি দীর্ঘ সময় ধরে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করলেও সমবায় অধিদপ্তর কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা প্রতারক সমিতিগুলোতে বিনিয়োগের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে একটি সমিতির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষার্থে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অকার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

সমবায় অধিদপ্তর থেকে পরিচালিত প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমবায়ীদের প্রয়োজন যাচাই করা হয় না। প্রশিক্ষণের কেন্দ্রগুলোর কিছু নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল আছে, যেগুলো হালনাগাদ করা হয় না। সমবায়ীরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হলেন কি না, তা কখনো মূল্যায়ন করা হয়নি। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ ভাতা দৈনিক ৬০ থেকে বর্তমানে ১২০ টাকা করার কারণে বর্তমানে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে সমবায়ীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা বর্তমান বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী সমিতিগুলোর সদস্যদের মনোনীত করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য কে মনোনীত হবে, তা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার সাথে সমিতির সদস্যদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। সাম্প্রতিক সময়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২.২.৯ সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

সমবায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, পদায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক

প্রভাব কাজ করে। ২০১২ সালে সমবায় অধিদপ্তরে পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, অফিস সহকারী-টাইপিস্ট, চালক ও পিয়ন পদে ৭ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যেখানে অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ ছাড়া যেসব উপজেলায় কার্যকর এবং সফল সমিতির সংখ্যা বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প আছে, সেসব এলাকায় বদলি হওয়ার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের আগ্রহ বেশি। এ ধরনের উপজেলায় বদলির জন্য ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ আদায় করা হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটনের থানা পর্যায়ে একজন সমবায় কর্মকর্তাকে বদলি হতে চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ দেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। যেসব জায়গায় নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি, সেখানে পদায়ন ধরে রাখতেও মাসে মাসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টাকা দিতে হয়।

সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত ও বিচার

সমবায় কর্মকর্তাদের অনিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় না। কারণ এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অভিযোগকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। অভিযোগ দায়ের করার পরেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না, যার পেছনে ঊর্ধ্বতন বা রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আইনগত যে পদ্ধতি, সেটি অনেক জটিল ও দীর্ঘ।

২.৩ সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

২.৩.১ *সমবায় সমিতির সীমাবদ্ধতা*

সঠিক বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের দক্ষতার অভাব

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব আছে। সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ ও প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সদস্যদের দক্ষতা নেই।

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্বের অভাব

সমিতি ব্যবস্থাপনায় সৎ ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অকার্যকর সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্যকর নেতৃত্বের অভাবে এসব সমিতি সঠিক দিকনির্দেশনা না পেয়ে অকার্যকর হয়ে গেছে। সময়ের প্রয়োজনের সাথে সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কর্ম-পরিচালনার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবনে নতুনত্ব দেখাতে পারছে না। এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সমবায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব

সমবায় সমিতিগুলো আর্থিক সক্ষমতার অভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে না। সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতিগুলোর আর্থিক সক্ষমতা নির্ভর করে সদস্যদের দ্বারা বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর। সরকারি বা অন্য কোনো আর্থিক সহায়তা না পাওয়া ও সদস্যদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে সমিতিগুলো লাভজনক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন

সমবায় সমিতির সাথে বহুসংখ্যক মানুষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যা রাজনৈতিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতিকরা নিজেদের পক্ষে সমবায়ের সদস্যদের ব্যবহার করতে চান। গবেষণার আওতাভুক্ত কয়েকটি এলাকায় রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রেরণায়, সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সমিতি গঠন করা হয়েছে, যেগুলো সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পেলেই কেবল কার্যকর থাকে।

সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলোর মধ্যে কিছু সমিতিতে সাধারণ সদস্যদের সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা যায়, যা তৈরি হয় প্রধানত সমিতিতে বিদ্যমান সম্পদ ভোগ করাকে কেন্দ্র করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভজনক পদগুলোতে থাকতে চান এবং সমিতির সম্পদ নিজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চান। সমবায় সমিতির সব ধরনের কর্মকাণ্ডে সাধারণ সদস্যদের যুক্ত না করার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সদস্যরা তাদের মূল পেশার পাশাপাশি সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত থাকার ফলে সমিতির সাথে সম্পৃক্ততাকে গৌণ দায়িত্ব হিসেবে দেখেন। অন্যদিকে সমবায় সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপারে সাধারণ সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনাগ্রহ ও অসচেতনতার কারণে সাধারণ সদস্যরা সমিতির সার্বিক কার্যক্রম, আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ধারণা রাখেন না।

২.৩.২ *সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি*

উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট রাখা

সমবায় সমিতির উপ-আইনে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালি সুনির্দিষ্ট না করে উদ্দেশ্য এমনভাবে লেখা হয়, যাতে এই আইন দ্বারা সমিতি যেকোনো ধরনের কাজ করতে পারে এবং এসব কার্যক্রমের আইনগত বৈধতা দেওয়া যায়।

সাধারণ সদস্য বা গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান প্রাথমিক সমবায় সমিতি পুঁজি সংগ্রহের জন্য সদস্য বা অসদস্য সবার কাছ থেকে আমানত বা বিনিয়োগ সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত না দিয়েই সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করে এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে। কিছু সমিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় সমিতি গ্রাহকদের কাছে যে পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সমপরিমাণ টাকা তাদের সঞ্চয়ে নেই, যা বিক্রি করে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া যায়।

উচ্চহারে সুদ আদায়

সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলো আমানতের টাকা উচ্চসুদে পুনরায় অন্যদের কাছে বিনিয়োগ করে। এ ধরনের কিছু সমিতি বিতরণকৃত ঋণের ওপর ৩০ থেকে ৪৫ শতাংশ হারে সুদ আদায় করে, যা সমবায় আইনের পরিপন্থী। কিছু সমিতি বিতরণকৃত ঋণের ওপর ১৮ শতাংশ হারে সুদ নেয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতাদের ছয় মাসের মধ্যেই ঋণ শোধ করতে হয়, ফলে তাদের ওপর সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশ।

সমিতির লভ্যাংশ বিতরণে অনিয়ম

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির লাভ কম দেখিয়ে সাধারণ সদস্যদের লভ্যাংশ কম দেন। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতির মূল শেয়ার ব্যবস্থাপনা কমিটির অধিকাংশ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ; যেখানে বিনিয়োগকারী বা সমিতির গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। তবে লভ্যাংশ কম দেওয়া হলেও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত খরচকে সমিতির খরচ হিসেবে দেখানো হয় এবং সমিতির খরচ বেশি দেখানোর মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের প্রকৃত লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার

সাধারণ সদস্যদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সমিতির সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেন। কিছু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্যোগী সদস্যরা সমিতির বেতনভোগী কর্মকর্তা হিসেবে সমিতিতে নিয়োগ নেন এবং নিজেদের চাহিদামতো বেতনভাতা আদায় করেন।

সমিতির কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার

সমিতি পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রভাবশালী সদস্যরা স্বেচ্ছাচারী আচরণ করেন। কিছু সমবায় সমিতি গঠনের পর এর সদস্য, মূলধন ও লভ্যাংশ বাড়ার সাথে সাথে সমিতি পরিচালনা কমিটির কিছু সদস্য সমিতির মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সমিতি থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। সমিতির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে সমিতির যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেদের সুবিধার্থে গ্রহণ করেন এবং সমিতির যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিজেদের সুবিধার্থে পরিচালনা করেন।

সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতি বিষয়ক তথ্য গোপন করা

প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতির আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করা হয়। সদস্য বা গ্রাহকদের উপ-আইন, ম্যানুয়াল বা নিয়মকানুনের কোনো বই বা ডকুমেন্ট সরবরাহ করা হয় না। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের কাছে কেবল তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের হিসাব দেখানো হয়। অনেক সমিতি সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে না অথবা নামমাত্র আয়োজন করলেও বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সমিতির লভ্যাংশ কিংবা পরবর্তী বছরের বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ

ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েকজন সদস্য সামগ্রিকভাবে সমিতির কার্যনির্বাহ করেন এবং সমিতি-সংক্রান্ত সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে সাধারণ সদস্যরা কেবল স্বাক্ষরসর্বস্ব সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের মধ্যেই সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকে।

'পকেট সমিতি' ও নামমাত্র সদস্যপদ

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয় ঋণদান সমিতির পরিচালনা কমিটি মূলত মালিকপক্ষ বা পরিচালনা কমিটির আস্থাভাজনদের সমন্বয়ে গঠিত বলে 'পকেট সমিতি' বা আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে গঠিত বলে 'পরিবারকেন্দ্রিক সমিতি' হিসেবেও অভিহিত। এ ধরনের সমিতির সদস্য দুই ধরনের : (১) মালিক বা সদস্য এবং (২) গ্রাহক। কিছু সমিতি ১০০ টাকার শেয়ার বিক্রির বিনিময়ে নামমাত্র সদস্য প্রদান করে, যারা সমিতির 'গ্রাহক' নামে পরিচিত। সমিতির সদস্যরা সমিতির সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করলেও গ্রাহক বা নামমাত্র সদস্যরা তাদের বিনিয়োগের অংশ ছাড়া সমিতির অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা পান না।

দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ

কিছু বহুমুখী ও সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি আর্থিক কর্মকাণ্ডের দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ করে–সমবায়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ও সমবায় অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য আরেকটি হিসাব। নিরীক্ষায় প্রদর্শনের জন্য হিসাবে সমবায়ের যে কোনো নিয়মবহির্ভূত বা অপ্রদর্শিত আর্থিক লেনদেনের হিসাব গোপন রাখা হয়।

আয়কর ফাঁকি এবং কালোটাকা বিনিয়োগের মাধ্যম

বহুমুখী ও সঞ্চয়-ঋণদান সমিতিগুলো অবৈধ আয় বা কালোটাকা গচ্ছিত রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমবায় সমিতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস যাচাই ও নির্দিষ্ট হারে কর দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং অতি মুনাফার প্রলোভনে অনেকে ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে সমবায় সমিতিতে রাখতে আগ্রহী। বহু প্রবাসী ও উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের উপার্জিত অর্থ অধিক লাভের আশায় এ ধরনের সমিতিতে বিনিয়োগ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-সংক্রান্ত অনিয়ম

কার্যকর সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে বারবার নির্বাচিত হন। সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা মনোনীত হন। কোনো কোনো সমিতিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সমবায় অধিপ্তরের উদ্যোগের অভাবে নির্বাচন হয় না এবং আগের কমিটি দিয়েই সমিতি পরিচালিত হয়।

নিরীক্ষা সম্পাদন কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া

নিরীক্ষা করার জন্য নোটিশ পাঠানো হলেও সমিতিগুলো একে গুরুত্ব দেয় না। নিরীক্ষা করতে গেলে সমিতিগুলো বিভিন্ন সমস্যা দেখায়, যেমন হিসাবের কাগজপত্র ঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই ইত্যাদি। অন্যদিকে সমিতির সাধারণ সদস্যদের সাথে সমবায় কর্মকর্তাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয় না। কিছু ক্ষেত্রে সমবায়ের শুধু কয়েকজন সদস্যকে দেখিয়ে এবং কয়েকটি প্রকল্প দেখিয়েই নিরীক্ষা সম্পাদন করানো হয়। অনেক সমিতির সদস্যরা সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদনের ব্যাপারে আগ্রহী নন। অন্যদিকে সচেতনতার অভাবে সমিতির সাধারণ সদস্যরা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কী আছে, সে ব্যাপারে জানতেও আগ্রহী নন।

সমিতির উপ-আইন অনুসরণ না করা

পরিচালনা কমিটির নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা ও সামগ্রিকভাবে সমবায়ের কর্মকাণ্ড কীভাবে চলবে, সে ব্যাপারে সমিতির উপ-আইনে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকলেও অনেক সমিতি উপ-আইন অনুসরণ না করে নিজেদের সুবিধামতো সমিতি পরিচালনা করেন। বিশেষ করে সমিতি থেকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির নিয়মনীতির লঙ্ঘন হয়।

দুর্নীতি-বিষয়ক তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার

সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায় না, অথাব সালিস-বিচারে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার করেন। বিশেষ করে সমিতির প্রভাবশালী কোনো সদস্য এ ধরনের অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. উপসংহার

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সমবায় সমিতিগুলো কার্যকর ও স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। নিবন্ধিত প্রায় অর্ধেক সমিতি দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর। সমবায় খাতের এ ব্যর্থতার মূলে রয়েছে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, পর্যবেক্ষণ, তদারকি, পরিচর্যা, নিরীক্ষা, প্রণোদনা এবং উৎসাহ প্রদানে নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত দুর্বলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি। অন্যদিকে সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি। এ ছাড়া নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও রয়েছে সমবায়ের প্রতি অবহেলা ও সিদ্ধান্তহীনতা। সমিতিগুলোর জন্য সরকারের ঋণকার্যক্রমও সীমিত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া আইনি সীমাবদ্ধতাও সমবায়ের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

৪. সমবায় খাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ

সমবায় সমিতি কর্তৃক বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ-সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে (১) সমবায় সমিতি আইন সংশোধন, (২) প্রতি মাসে সমিতি পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা, (৩) সমবায়ীদের প্রশিক্ষণভাতা বৃদ্ধি, (৪) সমিতি নিবন্ধনে মাঠপর্যায়ে যাচাই, (৫) দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, (৬) বহুমুখী সমিতি নিবন্ধন প্রদানে কঠোরতা, (৭)

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত একটি সমবায় সমিতির ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষায় এডহক কমিটি গঠন, (৮) উপ-আইনের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরণ বাধ্যবাধকতা, (৯) ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সমবায় সমিতি বিধিমালা প্রণয়নে ধারণা প্রদান, (১০) নিরীক্ষার জন্য নতুন মডিউল প্রণয়ন, (১১) নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অল্পকিছু সুসম্পন্ন বা যথাযথভাবে প্রয়োগ হলেও অধিকাংশই এখনো প্রক্রিয়াধীন বা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে।

৫. সুপারিশ

সমবায় আন্দোলন জোরদার ও সমবায় সমিতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিচে বিভিন্ন ইস্যু বা বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

৫.১ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা-সংক্রান্ত

১. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সমবায় সমিতি বিধিমালায়' সংশোধন আনতে হবে। এ বিধিমালায় সমিতি কর্তৃক সদস্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণ-সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে এবং বিধিমালা অনুসরণে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সমিতির সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিগুলোকে পাঁচ বছর অন্তর পুনর্নিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. আইন সংশোধনের মাধ্যমে আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমতির বিষয়টি বাতিল করে সদস্যদের সরাসরি আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

৪. আইন সংশোধনের মাধ্যমে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে প্রাক-যোগ্যতা ও প্রাক-নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৫. আইন সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে পাঁচ বছর বা তার অধিক সময় ধরে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর সমিতি অবসায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. সমবায় আইনের আলোকে সমবায় সমিতির ধরন অনুযায়ী উপ-আইন প্রণয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমিতির ধরন অনুসারে উপ-আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট টেমপ্লেট বা গাইডলাইন থাকতে পারে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতি পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদন্ত ও পরিচর্যার সময় সমিতির উপ-আইন অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২ নীতিনির্ধারণী-সংক্রান্ত

৭. 'সমবায় নীতিমালা' হালনাগাদ করে যুগোপযোগী 'সমবায় নীতিমালা' প্রণয়ন করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃ তফসিলীকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে।

৯. অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠপর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজ সহজতর ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে।

৫.৩ সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১১. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় সমিতির দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও লেনদেন, সদস্যদের ঋণ প্রদান ও আদায়, সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমের নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমিতির সংখ্যা অনুপাতে জনবল পদায়নে ভারসাম্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে, যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত। সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কীভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে, সে বিষয়ে সমবায়ীদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৫. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সমবায়ীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমবায়ীদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

১৬. সমিতিগুলোর মধ্যে উৎসাহ, আন্তসংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে সমিতির সভাপতি বা সম্পাদকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ বা সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। প্রতিবছর সমবায় অধিদপ্তর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের আয়োজন করতে পারে।

১৭. সমবায় অধিদপ্তরের গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সমবায় খাত নিয়ে কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮. সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-সহায়তা বাড়াতে হবে।

১৯. সমিতির দৈনন্দিন লেনদেনের ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে একক সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২০. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইনভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সেবাগুলোকে অনতিবিলম্বে ডিজিটাল করতে হবে।

৫.৪ অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ-সংক্রান্ত

২১. সমবায় অধিদপ্তরে একটি 'এথিকস কমিটি' গঠন করতে হবে, যার দায়িত্ব হবে সমবায় খাতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কমিটি–

- সমবায় অধিদপ্তরের সব পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করবে;
- সমবায় খাতের সুশাসনের জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব সমিতি ইতিমধ্যে গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন' প্রয়োগ করতে হবে।

২৩. সমবায় কর্মকর্তারা সমবায় সমিতি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো নিয়মবহির্ভূত সুবিধা বা উপঢৌকন যেন নিতে না পারে, সে জন্য তদারকি বাড়াতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অর্থ বিভাগ ২০১২, বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০১২, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

আকাশ, মম ২০১২, 'সমবায় মালিকানা একটি নতুন প্রস্তাবনা' সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৬০।

আহমেদ, ত ২০১২ 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সমবায় সেক্টরের পুনর্গঠন', সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৩৩।

আহমেদ, ত ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায়ের ভবিষ্যৎ : একটি রোডম্যাপের খসড়া', সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি :, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ২৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

নাথ, ধক ২০১২, 'জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায় আন্দোলনের নতুন দিগন্ত', সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আধুনিক প্রজন্মের সমবায়, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ২৯।

নাথ, ধক ২০১৩, 'সমবায়ের শতবর্ষ ও ভবিষ্যতের ভাবনা', সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৪৭-৪৮।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ২০১১, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, সমবায় আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি :, ঢাকা।

বিশ্বাস, সক ২০১৩, ত্রয়ী মনীষীর সমবায় ভাবনা ও তার বিশ্লেষণ, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লি :, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, সমবায় ভাবনা : সিরিজ-১, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি :, ঢাকা।

মালেক, এহ ২০১২, সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১২ ও কিছু কথা, সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি :, ঢাকা।

মোরশেদ, ম ২০১৩, 'বাংলাদেশে সমবায় : শতবর্ষের সারসংকলনের সংক্ষিপ্তসার', সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ১০২।

রহমান, হ ২০০৮, বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি, টিআইবি, ঢাকা।

রহমান, খম ২০১৩, 'সমবায়ের এক শতাব্দী', সমবায় আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ৬৬।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১১, 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-২০১১', পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩, স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০২৭.২৯.০০৮/১৩ ব্যাংক, বীমা-১৮৩, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০০১, সমবায় সমিতি আইন ২০০১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সমবায় অধিদপ্তর ২০১৩, সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।

সাহা, অক ২০১৩, 'আন্দোলনে সমবায় : সমবায়ীদের অবস্থান', সমবায় আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা. ২৪৫।

হালিম, এএমঅ ২০১৩, 'সমবায় মূল্যবোধ : একটি পর্যালোচনা', সমবায় আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তন, সমীর কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, অগ্রদূত পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

Ali, Z ২০১১, Assessment of the Contribution of the Department of Cooperative Movement and Poverty Alleviation in Bangladesh, BIDS, Dhaka .

Biswas, SK 2013 `Cooperatives: Present and Future Perspective', Agrodoot Publications Ltd., Dhaka.

Banglapedia 2012, `Cooperative Banking', Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka.

Ghosh, NB 2012, `Co-Operatives: A Few Words', Asian Journal of Science and Technology, Sociological Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata.

Indian Famine Comission report 1901, Office of superintendent of Government printing, Calcutta.

Sullivan, OA & Sheffrin, SM 2003, Economics: Principles in action, eds MA Quddus, Upper Saddle River, New Jersey.

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. শাহ্‌নূর রহমান

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই খাদ্যে ভেজালের ঘটনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, খাবার-জাতীয় কোনো পণ্যই এখন নিরাপদ নয়। শাকসবজি, মাছ-মাংস থেকে শুরু করে ফলমূলসহ নিত্যদিনের খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের প্রয়োগ হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ও জীবনহানির ঘটনা ঘটে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লাখ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়[৩১] এবং প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিরাপদ খাদ্য ও পানি।[৩২] জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে মোট ২১ হাজার ৮৬০টি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পণ্যের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায় ৫০ শতাংশে ভেজাল রয়েছে ।[৩৩]

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত খাদ্যপণ্যে ভেজাল জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেজাল খাবার গ্রহণ করে মানুষ যেসব মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে তার চিকিৎসার ব্যয় অত্যধিক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা লাগে বা আজীবন চিকিৎসা করতে হয়। এতে জনগণের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসার ব্যয়ে। সম্প্রতি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা ভেজাল প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে– নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩-এর খসড়া প্রণয়ন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ, এফবিসিসিআই ও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলার মোট ১৮টি কাঁচাবাজারকে ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে

---

* ২০১৪ সালের ২০ মার্চ ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

[৩১] http://www.fao.org/asiapacific/bangladesh/home/en/ (accessed on 14 november 2012)

[৩২] http://www.ban.searo.who.int/en/Section3/Section40/Section104.htm (accessed on 14 november 2012)

[৩৩] জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

একটি স্বতন্ত্র খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজালবিরোধী অভিযান পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়, কারণ খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি প্রতিবছরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ভেজাল খাদ্যের ব্যাপকতা অব্যাহত থাকে। খাদ্যে ভেজাল দিলেও ভেজালকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং তদারক-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্যের ব্যাপকতা, খাদ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গবেষণা হলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তদারক-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে–

- খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক আইনগুলো পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জগুলো নিরূপণ করা।
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনা করা।

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান আইনি কাঠামো, প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা ও পরীক্ষাগার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত উপাদানগুলো সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সেবার মান ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠপর্যায়ে কর্মপরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় ছয়টি (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউস, মোবাইল কোর্ট) প্রতিষ্ঠান ও চারটি পরীক্ষাগারকে (পিএইচএল, পিএইচএফএল, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউস) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৩ গবেষণাপদ্ধতি ও সময়কাল

গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণনির্ভর। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোর মহাপরিচালক, পরিচালক, কাস্টমস কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ক্যাব প্রতিনিধি, বন্দর

প্রতিনিধি, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, মৎস্য, শাকসবজি ও ফল ব্যবসায়ী, আড়তদার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষক এবং স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (সংশোধনী ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তক ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমটি ফেব্রুয়ারি ২০১৩-মার্চ ২০১৪ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ নিরাপদ খাদ্য তদারকির আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তিনটি আইন- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিচে এ তিনটি আইনের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলো :

২.২ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বলবৎ না করা

এ আইনটি ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর প্রণয়ন করা হয়। আইনের ১(২) ধারায় সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বলবৎ করার বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত আইনটি বলবৎ করার জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়নি।

২.৩ ভোক্তার সরাসরি মামলা করার বিধান না থাকা ও ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা

ভোক্তা কোনো খাবার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুস্থ হলে বা কোনো খাবারে ভেজাল বলে সন্দেহ হলে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ [৪১(ক)ধারা] ও ভোক্তা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (৬০ধারা)-এ সরাসরি মামলা দায়ের করার বিধান রাখা হয়নি। এ ক্ষেত্রে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলে আইনি পদক্ষেপ নেবেন। মামলা করার ক্ষেত্রে এসব প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে অনেক সময়ই ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অভিযোগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২.৪ নিরাপদ খাদ্য আইনে সরাসরি মামলা করার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ৬৬(৩)[৩৪] ধারায় সরাসরি মামলা দায়েরের বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভেজাল খাদ্য গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে হয়ে থাকে। এর ফলে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

---

[৩৪] নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৬(৩) ধারায় বলা হয়েছে, এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যেকোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

২.৫ প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠন না হওয়া

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ [৪১(১)][৩৫] এ দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত (প্রয়োজনে একের অধিক) গঠনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধশতকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠিত হয়নি। উপরন্তু দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনের বিষয়ে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের আদেশও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত সারা দেশের মধ্যে একমাত্র ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় একটি মাত্র খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.৬ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩তে শুধু প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনের বিধান রাখা

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯-এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত গঠনের উল্লেখ থাকলেও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৬৪(১)][৩৬] তে শুধু 'প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন বলবৎ হলে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠনের বাধ্যবাধকতা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৭ ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বাধ্যবাধকতা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৬২(৩) ধারা ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ৭৩(৩) ধারায় ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ ও প্রক্রিয়াগত জটিল হওয়ার কারণে আইনের এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভোক্তা তার অভিযোগ দায়েরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

২.৮ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না থাকা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠপর্যায়ে বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়নি। আইনে বলা হয়েছে, মহাপরিচালক বা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষার্থে বা পালনে তাদের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। এর ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করে।

২.৯ খাদ্যপণ্য পরিদর্শনে পরিদর্শকদের আইনি সীমাবদ্ধতা

মাঠপর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের আওতা আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা শুধু বাংলাদেশ পিওর ফুড রুলস

[৩৫] বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৪১(১) ধারায় বলা হয়েছে, The Government may, by notification in the official gazette, establish one or more pure food court, as it considers necessary, in each district and metropolitan area for the purpose of this ordinance.

[৩৬] নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে।

১৯৬৭তে উল্লিখিত ১০৭ ধরনের খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করতে পারেন। অপরদিকে বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ফিল্ড অফিসারদের কার্যক্রম ৫৮টি শিল্পজাত খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে অনেক খাদ্যপণ্য পরিদর্শনের বাইরে থেকে যায়।

২.১০ বিভিন্ন আইনে কঠোর শাস্তিদণ্ডের অভাব

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর শাস্তি ও জরিমানার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহতা, অপরাধ সংঘটনকারীদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ কম। উদাহরণস্বরূপ– বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫)-এ সর্বোচ্চ এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এ সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। নতুন প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩তে জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান করা হলেও এখানে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়নি। অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে ভারতে যাবজ্জীবন, পাকিস্তানে ২৫ বছর কারাদণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

২.১১ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যাহত থাকা

নিরাপদ খাদ্য-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত বা নিম্ন আদালতে ক্ষেত্রবিশেষে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। সাধারণত স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা নিম্ন আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট আদালত বিবাদীপক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে আসামি সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করেন। নিম্ন আদালত থেকে প্রাপ্ত এ সুযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়ই বিবাদী বড় কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত পেশা বা ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে দাবি করে বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করেন এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত রাখেন। বিবাদীপক্ষের এ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেক সময়ই ছয় মাস থেকে দুই বছর অথবা আরও দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেক সময় উচ্চ আদালত রুলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদীপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শনসহ নমুনা সংগ্রহের সব কার্যক্রম স্থগিত রাখেন। ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখেন।

৩. খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে অংশীজনের সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.১ নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সুনির্দিষ্টভাবে পদ না থাকা

নিরাপদ খাদ্যের নজরদারিতে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে পৃথক বা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়দায়িত্বের একটি অংশ

হিসেবে এ কাজটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দায়দায়িত্ব বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিরাপদ খাদ্যের তদারকিমূলক কাজ ছাড়াও তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কাজ করতে হয়। এসব কাজে তারা প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। এর ফলে তাদের কাছে নিরাপদ খাদ্য তদারকির কাজটি গৌণ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩.২ জনবলের স্বল্পতা

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিএসটিআই) কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় মাঠপর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি করপোরেশনে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৩৭০টি স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭৮ জন কর্মরত আছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সারা দেশে ৫৬৬ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকলেও তাদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিবেচনায় এই জনবল যথেষ্ট নয়। অপরদিকে ঢাকাসহ পাঁচটি বিভাগীয় শহরের বিএসটিআইয়ের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় ফিল্ড অফিসারের ৬৮টি অনুমোদিত পদ রয়েছে কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ৩৮ জন। মাঠপর্যায়ে এসব পদে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল স্বল্পতার কারণে নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন খাদ্য স্থাপনা (প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা, খাদ্যের বাজার) অপরিদর্শিত থেকে যায়।

৩.৩ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি ও পদোন্নতিতে সমস্যা

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি লক্ষণীয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণির হওয়ার কারণে নিজ দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক, বাজার পরিদর্শনে খাদ্য ব্যবসায়ী ও দোকানদার কর্তৃক এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য প্রসিকিউটিং এজেন্সির কর্মকর্তা দ্বারা অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে। এতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা হীনম্মন্যতায় ভোগেন এবং কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে সার্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের সুষ্ঠু তদারকি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। অপরদিকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের বিভাগীয়ভাবে পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই। উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা পদোন্নতির মাধ্যমে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে উন্নীত হলেও তাদের শুধু বেতনস্কেলে পরিবর্তন হয়, কিন্তু পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণিতেই থেকে যায়।

৩.৪ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে অনিয়ম

নিরাপদ খাদ্য তদারকির বিভিন্ন সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ যেমন– ফুড হ্যান্ডলিং প্র্যাকটিস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন, কমিউনিকেবল ডিজিজ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চেইনের সমসাময়িক তথ্যাদি সম্পর্কে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সীমিত। ফলে তারা মাঠ তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রমের সব নিয়ম সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। আবার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতেও অনিয়ম লক্ষ করা যায়। প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না এবং এ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সুসম্পর্ক, যোগাযোগ ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৫ খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব

খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব রয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্যের প্রাথমিক মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিটসের (স্যাম্পলিং স্পুন, সারফেস থার্মোমিটার, ফরমালিন টেস্টিং কিট, পিএইচ মিটার ইত্যাদি) অভাব রয়েছে। এ ছাড়া স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও বিএসটিআইয়ের ফিল্ড অফিসারদের বাজার মনিটরিং করার জন্য দাপ্তরিকভাবে কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাজার পরিদর্শনে তাদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

৩.৬ পরিদর্শন গাইডলাইন ও ম্যানুয়ালের অভাব

বিএসটিআইয়ের ফিল্ড অফিসারদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শন গাইডলাইন থাকলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও পরিদর্শন ম্যানুয়াল নেই। ফলে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথিব্যবস্থার দুর্বলতা লক্ষণীয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা কোনো একক পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। এর ফলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৩.৭ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের সমস্যা

মাঠপর্যায়ে পরিদর্শকরা খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা কাঠামোবদ্ধ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। তারা সাধারণত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুমানের ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। নমুনা সংগ্রহের পর তা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট জায়গা ও ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, শুধু সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, মোড়কজাতকরণ ও দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে মাঠপর্যায় থেকে প্রেরিত নমুনার ১৫-২০ শতাংশ বাতিল হয়।

৩.৮ খাদ্য তদারকি কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের শুধু নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে পৃথক কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। তাদের মাঝে মাঝে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা জেলা সিভিল সার্জন অফিসের কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে খুবই স্বল্প পরিমাণে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং তা অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিসের মোট কন্টিনজেন্সি বাবদ মাসিক বরাদ্দ দুই হাজার টাকা।

৩.৯ মাঠপর্যায়ে অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকা ও মামলা পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনজনিত মামলা পরিচালনার জন্য বিএসটিআই এবং কিছু পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এ ক্ষেত্রে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিজেকেই আদালতে মামলা উপস্থাপন করতে হয়। বিবাদীপক্ষের আইনজীবী পেশাদার হওয়ার কারণে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা

অনেক সময় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারেন না। আবার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। অনেক সময় খাদ্য স্থাপনা বা খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা অনেক সময়ই এসব ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে যোগসাজশ করে থাকেন। এর ফলে অনেক সময় নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না।

৩.১০ মাঠপর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি কাঠামোয় দ্বৈততা ও ঘাটতি

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি ব্যবস্থায় দ্বৈততা ও ঘাটতি লক্ষণীয়। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে উপজেলা পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখা হয়নি। উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জবাবদিহি সরাসরি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। আবার জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর উভয় পদ তৃতীয় শ্রেণির হওয়ায় তাদের মধ্যে কার্যকরভাবে জবাবদিহির ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। জবাবদিহির ব্যবস্থার দ্বৈততার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দায়দায়িত্ব পালনে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে পরিদর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

৩.১১ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও যোগাযোগের অভাব

নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু আইনিভাবে তাদের কর্মএলাকা নির্ধারণ, মাঠপর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয় থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে একে অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা লক্ষণীয়; এর ফলে প্রকৃত অর্থে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ ছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও প্রসিকিউটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। অনেক সময় জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রসিকিউশন কর্মকর্তারা ফিল্ডে হাজির হলেও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যস্ততা বা অনুপস্থিতির কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয় না এবং এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অফিস থেকে অনেক সময় তাদের সময়মতো অবহিত করা হয় না।

৩.১২ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশি সহায়তার অভাব ও নিরাপত্তার ঝুঁকি

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশি সহযোগিতার অভাব লক্ষ করা যায়। অনেক সময় জেলা প্রশাসন অফিসে মোবাইল কোর্ট টিম প্রস্তুত থাকলেও পুলিশি সহায়তা না পাওয়ার কারণে তারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বের হতে পারেন না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশি সহায়তার অভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিরাপত্তার ঝুঁকি লক্ষণীয়। অনেক সময় মোবাইল

কোর্ট টিমকে বাজারের দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা ঘেরাও করেন এবং তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করেন। এ ক্ষেত্রে টিমের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য না থাকলে তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হন এবং সার্বিকভাবে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৩.১৩ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তদারকির গুরুত্ব কম হওয়া

বর্তমানে মাঠপর্যায়ে কর্মরত অংশীজনের বেশির ভাগই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর ফলে তাদের কার্যক্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত পর্যায়ে খাদ্য ও খাবারের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অর্থাৎ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রম জোরদার করা। বাংলাদেশে খাদ্য তদারকি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে খাবার টেবিল (from farm to table) পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থাকে (entire food chain) প্রতিফলিত করে না।

৩.১৪ আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা

দেশের বিভিন্ন বন্দরে কাস্টমস হাউস কর্তৃক আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা লক্ষণীয়। এগুলো হলো– আইপিও অনুযায়ী জাহাজ বহির্নোঙরে থাকা অবস্থায় খাদ্যপণ্যের স্পেশাল এপ্রেইজমেন্ট করার নিয়ম থাকলেও তা না করে জেটিতে খাদ্যপণ্য খালাসের পর করা হয়। আবার নমুনা সংগ্রহকালীন প্রতিনিধিদের (কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারকের প্রতিনিধি ও জাহাজের মাস্টার) উপস্থিতির কথা বলা হলেও সব ক্ষেত্রে এ উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় না। অনেক সময় আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং নমুনা সংগ্রহে আদর্শ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। আবার খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রেও অনিয়ম লক্ষণীয়। আইপিও অনুযায়ী পরীক্ষাগারের প্রতিনিধি কর্তৃক কাস্টমস হাউসের নমুনা রুম থেকে দিনে দুবার অর্থাৎ সকালে ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করার বিধান থাকলেও তা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকের প্রতিনিধি নিজেই নমুনা পরীক্ষাগারে নিয়ে যান এবং নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট কাস্টমস হাউসে দাখিল করেন। অপরদিকে পরীক্ষাগারগুলোর সাথে যোগসাজশ করে আমদানিকারকের প্রতিনিধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে থাকেন।

৩.১৫ ফরমালিন আমদানিতে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব

ফরমালিন আমদানি শর্তযুক্ত পণ্যের তালিকায় থাকলেও আমদানির পরে এটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পরিবীক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থা নেই। ফরমালিন আমদানির অনুমতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র যেমন– ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যের সার্টিফিকেট, ব্যাংক সাটিফিকেট ইত্যাদি জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অবৈধভাবে দালাল চক্রের সহায়তা এবং আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ফরমালিন আমদানির সার্টিফিকেট সরবরাহ করা হয়। আবার ফরমালিন আমদানির পর তা কী

কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা মনিটরিং করার ক্ষেত্রে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্যব্যবস্থাপনা ও তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

৩.১৬ নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম শহর বা মহানগরকেন্দ্রিক হওয়া

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য অংশীজনের (বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ) নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহানগরকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ। উপজেলা বা গ্রাম পর্যায়ে এ-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম খুব বেশি দৃশ্যমান নয়। এ ছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমও প্রায় শহরকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অপরদিকে বিএসটিআই ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রমও বিভাগীয় শহরকেন্দ্রিক। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন যেমন– কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), স্থানীয় বাজার কমিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এ ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি রয়েছে।

৪. পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৪.১ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব

বিএসটিআইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার বাদে প্রতিটি পরীক্ষাগারেই (পিএইচএল, পিএইচএফএল, কাস্টম হাউস ল্যাবরেটরি) খাদ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। বর্তমানে এই পরীক্ষাগারগুলোতে যেসব যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে শুধু খাদ্যপণ্যের সাধারণ পরীক্ষা অর্থাৎ খাদ্যপণ্যটি ভেজাল অথবা ভেজালমুক্ত কি না, এটি জানা সম্ভব হয়। এ ছাড়া পরীক্ষাগারে খাদ্যপণ্যের নিয়মিত পরীক্ষা অর্থাৎ কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টক্সিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪.২ কাজের চাপ অনুযায়ী জনবলের অভাব

প্রতিটি পরীক্ষাগারেই কাজের চাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে (পিএইচ এল) প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে প্রায় ৭০০-৮০০-এর মতো নমুনা জমা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ ল্যাবরেটরির মৌলিক পদ হচ্ছে নয়টি (একজন পাবলিক অ্যানালিস্ট, দুজন প্রধান সহকারী ও ছয়জন ল্যাব সহকারী)। জনবলের অপ্রতুলতার কারণে এ ল্যাবরেটরিতে প্রতি মাসে ৩০০-৪০০ নমুনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। অপরদিকে বিএসটিআইয়ের ঢাকার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটি প্রয়োজনীয় জনবলসম্পন্ন হলেও বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগারগুলোতে জনবল-সংকট রয়েছে। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত নমুনার একটি বড় অংশ তারা নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে পরীক্ষা করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ– চট্টগ্রামের বিএসটিআইয়ের পরীক্ষাগারে শুধু খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রতি মাসে প্রায় ৫০০টির বেশি নমুনা জমা হয়; কিন্তু জনবল-সংকটের কারণে তারা ১৫০টির বেশি নমুনা পরীক্ষা করতে পারে না।

৪.৩ টেকনিক্যাল পদগুলোতে বিষয়-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা

বিএসটিআই ব্যতীত অন্য তিনটি পরীক্ষাগারে টেকনিক্যাল পদগুলোতে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ– নমুনা পরীক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরির মৌলিক দুটি পদ হচ্ছে যথাক্রমে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যানালিস্ট ও মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট (ল্যাবরেটরি)। এ পদ দুটির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট বা হেলথ টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। এখানে নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা এ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় থেকে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস বা ল্যাবরেটরি কারিগরি বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। এতে নিয়োগ-পরবর্তী সময়ে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪.৪ খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী মাঠপর্যায়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রেরিত নমুনা জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে পাঠানোর সাত দিনের মধ্যে সনদ প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল স্বল্পতার কারণে নমুনা পরীক্ষায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। অপরদিকে পরীক্ষাগারগুলোতে পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের জন্য আন্তপরীক্ষাগার ক্রস চেকিংয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে পরীক্ষাগারগুলোর দক্ষতা ও পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, শুধু বিএসটিআইয়ের কেন্দ্রীয় ল্যারেটরিতে ক্রস চেকিংয়ের ব্যবস্থা আছে।

৪.৫ বন্দরগুলোতে পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও পরীক্ষাগার সচল না থাকা

দেশে আমদানিকৃত খাদ্যজাত দ্রব্যের ৮০ শতাংশ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে প্রবেশ করে। আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও বেনাপোল কাসটম হাউসের অধীনে দুটি পরীক্ষাগার আছে। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের পরীক্ষাগারটিতে খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। অপরদিকে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি গবেষণাগার ভবন নির্মাণ করা হলেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও জনবল নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে পরীক্ষাগার ভবনটি কাস্টম হাউসের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪.৬ খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

পরীক্ষাগারগুলোতে খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজশ লক্ষ করা যায়। যেহেতু পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক জনবল ও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, তাই পরীক্ষাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক সময় নমুনা পরীক্ষা না করে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে

(ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি) সনদ প্রদান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারগুলোর পাবলিক অ্যানালিস্ট পরীক্ষিত দ্রব্যের পয়েন্ট কমিয়ে বা বাড়িয়ে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। আবার বিএসটিআই কর্তৃক শিল্পজাত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসার ও কোম্পানিগুলোর মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। অপরদিকে মাঠপর্যায়ে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টররাও নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন। তারা খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে যদি নেতিবাচক রিপোর্ট আসে, তাহলে মামলা করার ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে থাকেন এবং পরে পরীক্ষাগার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশে নেতিবাচক রিপোর্টকে ইতিবাচক হিসেবে সংগ্রহ করে।

৫. নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং ফিল্ড অফিসার (বিএসটিআই) কর্তৃক খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন ও খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা পরিদর্শনের সময় ক্ষুদ্র খাদ্য প্রস্তুতকারী ও ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতাদের আইনি ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে। আবার মাসিক ভিত্তিতে তারা বড় দোকানদার, রেস্তরা ও বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতামূলক দুর্নীতি করে থাকে। তারা অনেক সময় আইনের ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাও আদায় করে। নিয়ম অনুযায়ী মাঠ পর্যায় থেকে খাদ্যপণ্যের নমুনা কিনে পরিক্ষার জন্য পাঠানোর বিধান থাকলেও তারা বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নমুনা পরিক্ষার কথা বলে দাম না দিয়ে খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে এবং এভাবে সংগৃহীত পণ্য ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে। অপরদিকে বিএসটিআইয়ের ফিল্ড অফিসাররা ব্যাচ অনুযায়ী খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ না করে ঘুষের বিনিময়ে শিথিলতা প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য, বিএসটিআই কর্তৃক এসব খাদ্যকারখানা সঠিক ও নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এরকম নিম্নমানের পণ্য সহজেই চিহ্নিত করা যেত। আবার যেহেতু পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক জনবল ও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, তাই পরিক্ষাগারসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক সময় নমুনা পরিক্ষা না করে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে (ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি) সনদ দেয়।

৭. সুপারিশ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত, টেকসই করা এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হচ্ছে :

৭.১ আইনি কাঠামো-সংক্রান্ত

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ নিম্নোক্ত সংশোধনী এনে তা দ্রুত বলবৎ করতে হবে:

- প্রতিটি জেলা ও মহানগরে এক বা একাধিক খাদ্য আদালত গঠন।
- ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করা ।

- ভোক্তা কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার রহিত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে বহনের বিধান করা।

২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে:

- ভোক্তার সরাসরি মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা।
- বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতা রাখা।

৩. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা সংশোধনী আনতে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন যেমন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআইয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সারনি-: নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির ক্ষেত্র ও পরিমান

জড়িত কর্মকতা/কর্মচারীর ধরর্ন	প্রতিষ্ঠান	ঘুষের ক্ষেত্র	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ক্ষুদ্র খাদ্য প্রস্তুতকারী ও খুচরা	২০০-৪০০*
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	মাসিক ভিত্তিতে রেস্তোঁরা, বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতা	৫০০-১০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	ছোট বা মাঝারি খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	৫০০০-১০০০০*
ফিল্ড অফিসার	বিএসটিআই	বড় খাদ্য কারখানা পরিদর্শন	পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টম হাউস	আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা	১০০০-১৫০০
কর্মকর্তা-কর্মচারী	কাস্টম হাউস	কাস্টম হাউস নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল	৫০০-৮০০

(সংশ্লিষ্ট সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে)
* উপজেলা/জেলা/মহানগর পর্যায়ে একটি খাদ্য ব্যবসা/দোকান/কারখানা পরিদর্শন করতে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা উপরিউক্ত হারে ঘুষ গ্রহণ করেন। সুতরাং তাদের আওতাধীন সব খাদ্য স্থাপনা থেকে এক মাসে আদায়কৃত মোট ঘুষের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

চিত্র-: নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

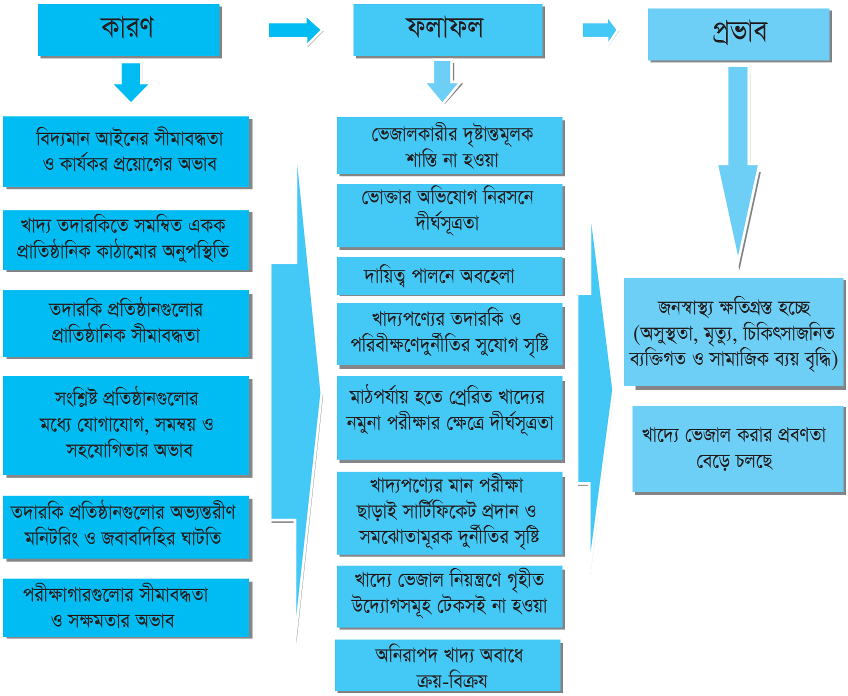

৭.২ প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা-সম্পর্কিত

৫. নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক তদারকির জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর বিধান অনুযায়ী অতিসত্বর 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে।

৬. পরিদর্শকদের কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দিতে হবে এবং বিদ্যমান ফাঁকা পদগুলো অতিসত্বর পূরণ করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদাসম্পন্ন করতে হবে।

৮. খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. খাদ্য তদারকি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শন কাজে গতি আনতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠপর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।

১২. জেলাপর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রম বেগবান করতে হবে এবং আইনে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

১৩. মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে কর্মরত পরিদর্শকদের (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফিল্ড অফিসার, খাদ্য পরিদর্শক) জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে প্রশাসন ও তদারকি-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অন্যান্য অংশীজনের (যেমন– সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও সাংবাদিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত

১৫. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি' ও বেনাপোল স্থলবন্দরের পরীক্ষাগারটিতে জনবল নিয়োগ দিয়ে দ্রুত চালু করতে হবে।

১৬. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে আন্তযোগাযোগ, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক পরিচিতি

নাজমুল হুদা মিনা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নাজমুল হুদা তৈরি পোশাক খাত ও ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত।

মো. রবিউল ইসলাম

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। রবিউল ইসলাম স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান, ভূমি অধিগ্রহণ, নিরাপদ খাদ্য-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত। বর্তমানে তিনি সাউথ-সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের অধীনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নেপালে ফ্রেডসকর্পসেট ফেলো হিসেবে কর্মরত।

নীহার রঞ্জন রায়

ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নীহার রঞ্জনের গবেষণার প্রধান বিষয় ভূমি খাত (ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা কার্যক্রম)। এ ছাড়া তিনি সমবায় খাত (সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা) এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়েও গবেষণা করেছেন।

নাহিদ শারমীন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান।

মো. শাহনূর রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ২০০৫ সাল থেকে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ-সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে এক বছর মেয়াদি

ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য, পাসপোর্ট সেবা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যাপরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

জুলিয়েট রোজেটি

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান (সংসদ), তথ্য অধিকার এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও খাত (বন্দর ও কাস্টম হাউস)।

মনজুর ই খোদা

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টর্প বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের স্থল ও সমুদ্র বন্দর এবং কাস্টম হাউস ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় সুশাসন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

তাসলিমা আক্তার

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

দিপু রায়

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার

প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ও এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সততা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ খাত, এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত ।

মো. রেযাউল করিম

প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন । তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে জাতীয় সততা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (সরকারি কর্মকমিশন, নির্বাহী বিভাগ), গণপরিবহন খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে তিনি ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন অ্যাকাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত ।

শাহজাদা এম আকরাম

সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন । তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততা ব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং শ্রম অভিবাসন ।

মোহাম্মদ হোসেন

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন । তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন । মোহাম্মদ হোসেন সমবায় খাত, ভূমি অধিগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গবেষণার সাথে জড়িত । বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দুর্নীতি ও সুশাসন' বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত ।

নীনা শামসুন নাহার

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন । নীনা শামসুন নাহারের গবেষণার বিষয় হচ্ছে শিক্ষা খাত ও প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও তৈরি পোশাক খাত ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক চারটি সংকলন ইতিমধ্যে ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চম সংকলন ২০১৬ সালের একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো।

978-984-34-0189-2